তাপসী বসুমতী-মা

প্রতিভা চট্টোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন, কলকাতা-৯

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ বিধান সরণী
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

উৎসর্গ

মাতা ঠাকুরাণী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর সাক্ষাৎ-সন্তান
পরমপূজ্য শ্বশুরমহাশয় ৺কৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়-এর পদপ্রান্তে
ভক্তিনম্র পুষ্পাঞ্জলি।

প্রাক্-ভাষণ

অধ্যাত্ম-জগতের পরশমণি ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই দেখতে পাই, স্নেহভরে যাঁদেরই তিনি স্পর্শ করেছেন, মনের কোণে ঠাঁই দিয়েছেন, উত্তরকালে তাঁদের প্রত্যেকেই রূপান্তরিত হয়েছেন খাঁটি সোনায়।

বসুমতী-মা, বালিকা থাকা কালে ঠাকুর রামকৃষ্ণ যাঁর নামকরণ করেছিলেন ভবতারিণী, সাধিকা হিসাবে হয়ে উঠেছেন এমনি এক খাঁটি সোনা। রামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীতে এই তপস্বিনীর, এই মাতৃস্বরূপিণী সাধিকার পুণ্যস্মৃতি বহু ভক্তের অন্তরের মণিকোঠায় বিরাজ করছে চিরপ্রোজ্জ্বল হয়ে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবী উভয়েরই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল বসুমতী-মার। কিন্তু শুধু আত্মীয়তা থাকলেই আত্মার সম্পর্ক গড়ে ওঠে না, সে সম্পর্ক গড়ে ওঠে পূর্বজন্মের শুভ সংস্কার, ঈশ্বরীয় কৃপা আর আত্মিক সাধনার সৌভাগ্যের বলে। বসুমতী-মার জীবনে দেখা গিয়েছে এর সব কয়টি সৌভাগ্য, তাই আত্মীয় শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছিলেন আধ্যাত্মিক সম্পর্কের দ্বারা, ঠাকুরের স্নেহাশিস্ অবিরল ধারায় ঝরে পড়েছিল তাঁর ওপর, ফলে আপ্তকামা হতে পেরেছেন তিনি।

পরম আনন্দের কথা, শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যস্পর্শে উদ্দীপিতা, উদ্ভাসিতা, এই মহীয়সী ভক্ত নারী আজো বেঁচে রয়েছেন আমাদের ভেতরে। বারাণসীর পুণ্যভূমির এক কোণে, একান্তে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যানে তিনি দিন যাপন করছেন।

বয়স হবে প্রায় ছিয়ানব্বুই। শহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, ঔরঙ্গাবাদের রামাবাস-এ এই ক্ষীণদেহ তপস্বিনী তাঁর নিজস্ব নিভৃতি রচনা ক'রে ঠাকুরের চিন্তায় ডুবে রয়েছেন। মহল্লার নরনারীর তিনি অতি আপন জন, তাঁদের তিনি বুড্ঢা মাঈ। আর রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু ব্রহ্মচারীদের তিনি পরম আদরের বুড়ী-মা—বসুমতী-মা। সুপ্রসিদ্ধ বসুমতী পত্রিকা ও প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পত্নী তিনি, তাই সবাই তাকে বসুমতী-মা বলে।

ছয়

শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য স্মৃতি জাগিয়ে-তুললে তার উদ্দীপনায় আজো এই প্রবীণা সাধিকার চোখ মুখ ঝলমল ক'রে ওঠে, নিজের কৃপাধন্য জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাহিনীটি বলতে গিয়ে প্রাণোচ্ছল হয়ে ওঠেন তিনি।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের পুণ্যদেহ স্পর্শ করেছেন বসুমতী-মা, আদুরে মেয়ের মতো আব্দার করেছেন, ঝগড়া করেছেন তাঁর সঙ্গে, তাঁর কোলে উঠেছেন অবলীলায় ও স্বচ্ছন্দে। তারপর দীর্ঘ ধ্যান মননের ফলে পেয়েছেন ঠাকুরের দিব্য দর্শন ও দিব্য কৃপা। পরম সৌভাগ্যবতী ও পুণ্যবতী নারী তিনি, তাই শুধু বারাণসীর রামকৃষ্ণ মঠের সাধু ও ভক্তেরাই নয়, সর্ব সম্প্রদায়ের সাধক ও ভক্তেরাই বসুমতী-মাকে উচ্চকোটির সাধিকা বলে গণ্য করেন, ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। তাঁর মুখে ঠাকুর ও দেবী সারদামণির স্মৃতি-কাহিনী শোনার জন্য সবাই উন্মুখ হয়ে বসে থাকেন।

তাপসী বসুমতী-মা কৃপাসিদ্ধা। এই কৃপাসিদ্ধি শুধু সেই মহাসাধকই দান করতে পারেন নিজে যিনি তপস্যার বলে সিদ্ধি ও পরম প্রাপ্তির শিখরে অধিষ্ঠিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছিলেন এমনি এক অসামান্য মহাসাধক, তাই তাঁর কৃপাশক্তি বসুমতী-মার শুদ্ধ আধারে অবলীলায় ঢেলে দিতে পেরেছে দিব্য-লোকের আলোক-ধারা।

'ঠাকুরকে দেখেছেন আপনি?' আজো এই প্রশ্ন কেউ করলে স্নিগ্ধ আলোর ঝলক দেখা যায় বসুমতী-মার চোখ দুটিতে।

উত্তরে বলেন, "দেখেছি কেবল! স্পর্শও পেয়েছি কতো—স্পর্শমণির স্পর্শ! মা'র বাপের গাঁয়ের মেয়ে আমি। ডান হাতের মাঝের এই আঙুল মা'র মুঠিতে দিয়ে ছোট্ট মেয়েটি আমি কতবার গেছি ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর সস্নেহে বলতেন, আহা, কুমারী মেয়ে, ওকে আগে খেতে দাও গো।"

দেবী সারদামণির স্নেহ ও আশিস্ পেয়েও কৃতার্থা হয়েছিলেন বসুমতী-মা। পুরাতন দিনের স্মৃতির টুকরোগুলো মনের কোণে ভিড় ক'রে আসে, আর আনন্দের আভা ছড়িয়ে পড়ে তাঁর চোখে মুখে। আপন মনে বলে চলেন, "আমার বিয়ের পাত্র ঠিক করেছিলেন ঠাকুর আর মা। বিয়ের আগে ওনাদের মুখেই শুনেছিলাম, অমুক মুখুজ্জে খুব রূপবান। আমায় কেউ কেউ কালো মেয়ে বলতো। মা আপত্তি জানিয়ে বলতেন, কালোই জগতের আলো। মাঝে মাঝে

আমি নিজেই দক্ষিণেশ্বরে চলে যেতুম ঠাকুরের কাছে। তিনি মাকে বলতেন—'ওগো ভবতারিণী এসেছে, ওকে তোমার কাছে রাখো। যেতে দিও না। কিছুদিন আটকে রাখো।' মায়ের স্নেহ লাভ করেছি অফুরন্ত। তাতেই আমার জীবন ধন্য হয়ে গেছে।"

বসুমতী-মা'র আসল নাম ভবতারিণী। এ নাম ঠাকুর রামকৃষ্ণের দেওয়া। বাপ মা তাঁর ছোটবেলায় নাম রেখেছিলেন 'হাবি'। ঠাকুর রামকৃষ্ণ একদিন তাঁর মাকে বললেন, "খুড়ী, মেয়ের একি নাম রেখেছো, বলতো ?"

উত্তর হলো, "তুমিই বরং ওর একটা ভাল নাম রেখে দাও।"

ঠাকুর হেসে বললেন, "তা তোমাদের ঐ কুসুম, নলিনী, কামিনী, মালতী এসব নাম আমি রাখতে পারবো না। আমি রাখলাম—ভবতারিণী।"

মাতৃময় রামকৃষ্ণ জগন্মাতার নামেই করলেন তাঁর আদরের হাবির নামকরণ। সেই সঙ্গে সেদিন বুঝি মনে মনে মাতৃচরণেই উৎসর্গ করেছিলেন এই মেয়েটিকে।

বিয়ের সময়কার স্মৃতি মন্থন ক'রে বসুমতী-মা আজো কত কথাই না বলেন। আর তাঁর সব কথাই ঠাকুর রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র ক'রে। শ্রীমতী রানী চন্দের কাছে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বসুমতী-মা বলেছেন :

ঠাকুর আমায় বড় স্নেহ করতেন। আমার বিয়ে তো ঠিক করলেন, কিন্তু কালো মেয়ে—শাশুড়ীর মন ওঠে না। বলেন, 'আমার অমন সুন্দর ছেলে, কালো বউ আনি কি ক'রে ?'

ঠাকুর বললেন, 'ভাখো, ঐ কালো মেয়েই আলো, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে তোমার।'

আমার মা বলেন, 'চাল নেই, চুলো নেই, মামার বাড়িতে মানুষ—ও ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব কী! মেয়ে আমার ভাতে-কাপড়ে কষ্ট পাবে।'

ঠাকুর বললেন—'খুড়ী'—মাকে ঐ বলেই ডাকতেন, এক সম্পর্কে খুড়ীই হতেন—'ঐ ঘরেই তোমার মেয়ে দাও ; মেয়ে তোমায় রাজরানী হবে।' তাঁর কথাতেই দুপক্ষ শেষে মত করলো।

অন্তর্যামী ঠাকুর রামকৃষ্ণ জানতেন, তাঁর আদরের ভবতারিণীর বিয়ের ফুটো কোথায় বাঁধা আছে। আরও তিনি জানতেন, ভাবী বর, তাঁর ভক্ত উপেন, শুভ সংস্কারযুক্ত যুবক ; তাঁর সঙ্গে বিয়ে হলে ভবতারিণী যেমন একটি ভক্তিপরায়ণ

শুদ্ধাত্মা স্বামী পাবে, তেমনি সেও পাবে একটি বিদ্যারূপিণী স্ত্রী। আত্মিক জীবনের পথে কেউ কারুর অন্তরায় হবে না, বরং হবে একে অন্যের পরিপূরক।

ভবতারিণীর স্বামী উপেন্দ্রনাথ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য ভক্তদের অন্যতম। বালক বয়সে উপেন্দ্রনাথ তাঁর পিতাকে হারান, মানুষ হন মাতুলের বাড়িতে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে ঠাকুরের কাছে নীরব প্রার্থনা জানিয়েছিলেন অর্থ সাচ্ছল্যের জন্য। তাঁর এ প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছিল ঠাকুরের আশীর্বাদে। উত্তরকালে বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্রষ্টা ও মালিক রূপে প্রভূত ধন সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি, আর এ সম্পদের সদ্ব্যবহারও করেছিলেন অশেষভাবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের শবাধার বহনের কালে এক বিষাক্ত গোখরো সাপ উপেন্দ্রনাথকে দংশন করেছিল, কিন্তু বিদ্রোহী ঠাকুরের কৃপায় তাঁর জীবন রক্ষা পেয়েছিল। এই কৃপাসঞ্জীবিত জীবনকে উপেন্দ্রনাথ নিয়োজিত করেছিলেন ঠাকুর ও তাঁর শিষ্যদের ঈপ্সিত কল্যাণকর্মে।

উপেন্দ্রনাথ তখনো ছোট্ট একটি বই-এর দোকানের মালিক; নিত্যকার আর্থিক সংগ্রামে জীবন তাঁর ক্ষতবিক্ষত।

সে সময়েও, রামকৃষ্ণ ভক্তদের সেবা পরিচর্যায় তাঁর উৎসাহ ও আন্তরিকতার অবধি ছিল না। স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিকথায় আমরা পাই :

"ঠাকুরের অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরে স্বামীজী প্রমুখ আমরা কয়জন গুরুভাই যখন কোন কোন দিন কাঁকুড়গাছি পর্যন্ত গিয়া রাত্রি প্রায় আটটার সময় ক্ষুধাতুর অবস্থায় উপেন্দ্রের সেই ছোট্ট দোকানটিতে পৌঁছিতাম, উপেন্দ্র তৎক্ষণাৎ এক চাঙাড়ি নানা প্রকারের খাবার ও দোনা দোনা জল খাওয়াইয়া তাজা করিয়া দিত। বিডন স্কোয়ারের ধারে ছ্যাকড়া গাড়ির আড্ডা ছিল। গাড়োয়ানরা 'বরানগর কাশীপুর চার পয়সা' বলিয়া হাঁকিত। ভাড়া দিয়া উপেন্দ্র আমাদের সেই গাড়িতে তুলিয়া দিত। এইরূপে কতদিন যে সে আমাদের খাওয়াইয়া বরানগরের গাড়িতে চাপাইয়া দিত তাহা বলা যায় না।"

লাটু মহারাজ এবং বেলুড় মঠের অন্যান্য সাধুরাও প্রায়ই উপেন্দ্রনাথের সাহায্য প্রাপ্ত হতেন, আপনজন জ্ঞানে তাঁর কাছে যাওয়া আসা করতেন।

উপেন্দ্রনাথ জীবনে শুধু অর্থই চান নি, পরমর্থাও চেয়েছিলেন আন্তরিকভাবে। সমকালীন বাংলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক ছিলেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে ভক্তপ্রবর কুমুদবন্ধু সেন লিখেছেন:

"পাশ্চাত্য দেশ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ কলিকাতায় আসিতেছেন—ইহা লইয়া কলিকাতায় তুমুল সাড়া পড়িয়া গেল। কলিকাতা অভ্যর্থনা-সমিতির আয়োজনে স্বামীজীকে খিদিরপুর হইতে স্পেশাল ট্রেনে শিয়ালদহ স্টেশনে আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। উপেন্দ্রবাবু পূর্বদিন কলিকাতা ও শহরতলির প্রায় সর্বস্থানে প্লাকার্ড মারিয়া বড় বড় অক্ষরে স্বামীজীর পৌছিবার স্থান ও কাল জানাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত হাজার হাজার হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া স্বামীজীকে সংবর্ধনা করিবার জন্য কলিকাতাবাসীদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সমস্ত উপেন্দ্রবাবুর নিজব্যয়ে।"

অভ্যর্থনা সমিতি শুধু সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্বামীজীর আসন্ন আগমনের সংবাদ ছাপিয়েই নিরস্ত ছিলেন। তাই প্রধানত উপেন্দ্রনাথের দক্ষতা ও উৎসাহের ফলেই সেদিন শীতের প্রত্যুষেও শিয়ালদহ স্টেশন লোকে লোকারণ্য হয়েছিল, স্বামীজীকে জানিয়েছিল বিপুল অভিনন্দন। তাঁর একাজ দেখে ঠাকুরের প্রবীণ শিষ্য গিরিশ ঘোষমশাই আনন্দে মুখর হয়ে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, "উপীন, ভাই, তুই সত্যিই একটা মস্ত কাজ করলি।"

শক্তিধর সাংবাদিক ও সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সাহিত্য' পত্রিকায় উপেন্দ্রনাথ ও তাঁর বসুমতী-মন্দির সম্বন্ধে লিখে গিয়েছেন:

"বসুমতীর একজন প্রিণ্টার রাধিকাপ্রসাদ একদিন বলিয়াছিলেন—এটা বসুমতী অফিস নয়, রামকৃষ্ণের সদাব্রত। ইহা সত্য। উপেন্দ্রনাথ এই সদাব্রতের ভাণ্ডারী ছিলেন। এই সদাব্রত হইতে ভাণ্ডারী উপেন্দ্রনাথ লক্ষ লক্ষ পুঁথি প্রচার করিয়া বাঙালীর মনের খোরাক যোগাইয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ 'ভোগীর' দুর্ভাগ্য ভোগ করিবার দুষ্কৃতি লইয়া আসেন নাই। তিনি রামকৃষ্ণ-মণ্ডলীর একটা হাতবাক্স। লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়াছেন; আর পাত্রসাৎ করিয়াছেন। সদাব্রত নয়?"

অর্থার্থী ও ধর্মার্থী দুই-ই ছিলেন উপেন্দ্রনাথ, আর ছিলেন রামকৃষ্ণের

কৃপাকাহিনী প্রচারে সদা উৎসাহী। তাই এমন ধর্মপ্রাণ স্বামীর সাহচর্য পেয়ে সহজতর হয়েছিল বসুমতী-মা'র জীবন-সাধনা। উত্তরকালে রামকৃষ্ণময়ী মহাসাধিকারূপে যে উত্তরণ তাঁর ঘটেছে, তাঁর মূলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সারদা-দেবীর কৃপা যেমন ছিল, তেমনি ছিল গুরুনিষ্ঠ উপেন্দ্রনাথের পুণ্যময় সাহচর্যের প্রভাব।

বসুমতী-মা আজো নিভৃতচারিণী তপস্বিনীরূপে অধিষ্ঠিতা রয়েছেন কাশীধামে। আজো তাঁর পুণ্য-সান্নিধ্য লাভ ক'রে, তাঁর তত্ত্বোজ্জ্বলাবাণী শ্রবণ ক'রে, ধন্য হচ্ছেন বহুতর ভক্ত নরনারী। তাঁদের কাছে বসুমতী-মার বাণীর মর্ম :

ঠাকুর রামকৃষ্ণের অনুধ্যান ও জপ ক'রে যাও নিরন্তর ধারায়, জীবনের আধারটিকে শুদ্ধ ক'রে তোল, তৈরী ক'রে তোল তাঁর দিব্য কৃপা ধারণ করার জন্য।

কনখলে বসে এই মহীয়সী তাপসী একদিন শ্রীমতী রানী চন্দকে যা বলেছিলেন, তা থেকে তাঁর জীবন ও বাণীর তাৎপর্য ফুটে ওঠে যে কোন মুমুক্ষুর মানসপটে :

বসুমতী-মার সামনে একটা দেশলাই পড়ে ছিল। সেটা হাতে নিয়ে, একটা কাঠি খুলে খস্ ক'রে জ্বেলে বললেন, 'ছাখো, এই খস্ করলুম আর জ্বলে উঠলো।'

জ্বলন্ত কাঠিটা ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'এখন এইটুকুতে সমস্ত কনখল পুড়ে যাবে।'

ফুঁ দিয়ে আগুনটা নিবিয়ে দেশলাইয়ের কাঠি দূরে ফেলে দিলেন। বললেন, 'এই আগুনটুকু মা আগে জ্বালাতে হবে। আগে মাটি তৈরী করো, তবে তো গাছ পুঁতবে? মাটিই যদি না তৈরী থাকে, তবে গাছ বাঁচবে কি ক'রে, বলতো?'

তাপসী বসুমতী-মার পরম সৌভাগ্য, তাঁর সাধন জীবনের মাটি প্রস্তুত ক'রে দিয়েছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও দেবী সারদামণি তাঁদের হস্তের পুণ্যস্পর্শ দিয়ে। শুধু তাই নয়, সে মাটিতে যে কৃপা-বীজ রোপিত হয়েছিল তা থেকে উত্তরকালে বেরিয়ে এসেছে এমন এক তপস্যাপূত মহাজীবন যা আজো বহু ভক্ত নরনারীর জীবনকে এগিয়ে দিচ্ছে পরমপ্রাপ্তির দিকে, আনন্দময় চৈতন্যলোকের দিকে।

এগার

লেখিকা ও তাঁর স্বামী রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কলকাতা থেকে কাশীতে বারবার ছুটে গিয়েছেন তাপসী বসুমতী-মার কাছে। অধ্যাত্ম-জীবনের স্নেহচ্ছায়া তাঁরা পেয়েছেন, আর সেই জীবন ও বাণীর মর্মকথা এখানে আন্তরিকতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন সবাইকে। এ গ্রন্থের ভাব হৃদয়-স্পর্শী এবং সংবেদনশীল, ভাষা সহজ এবং সাবলীল। এক এক সময়ে মনে হয়, বসুমতী-মার উচ্চারিত স্নিগ্ধ-মধুর কথাগুলো আমরা যেন শুনছি একটা টেপরেকর্ডার-এর মাধ্যমে। স্মৃতিকথা ও সংলাপ পরিবেশনার দিক থেকে এটা লেখিকার কম কুশলতার কথা নয়। শুধু ঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর ভক্তেরাই নয়, অধ্যাত্মরস-পিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই। এ গ্রন্থ পড়ে তৃপ্ত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

—শঙ্করনাথ রায়

বহুদিনের বাসনা ঠাকুর যে এভাবে পূরণ করবেন, স্বপ্নেও ভাবিনি। তাই, যখন শুনলাম. কর্তা চলেছেন কাশীধামে বসুমতী-মার চরণদর্শনে, মনের মধ্যে আনন্দের ঢল নামল।

মাত্র তিন দিনের মেয়াদ। শুক্রবার রাত্রে রওনা হয়ে সোমবার বিকেলে পূর্ণযাত্রা। বড়ই সংক্ষিপ্ত সফর।

কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সম্পাদক, পূজনীয় স্বামী ভাস্বরানন্দ মহারাজের আহ্বানলিপি পাওয়া মাত্র গোছগাছ শুরু হয়ে গেল। বার্ষিক পরীক্ষার বিভীষিকা মেয়েদের সামনে। ফলে, 'আমি তব হব সাথী' বলল না কেউ।

মাসিক বসুমতীর পৃষ্ঠায় যেদিন পড়েছি, বসুমতী-মার সঙ্গে জনৈক ভক্তের সাক্ষাৎকার, মনের মধ্যে কেমন যেন আকুল আহ্বান শুনেছি দিনের পর দিন। বার বার মন চেয়েছে ছুটে যেতে সেই মহীয়সী নারীর পদপ্রান্তে যিনি সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন, জীবন্ত নারায়ণ পরমপুরুষের। সেবা করেছেন মা-সারদা সরস্বতী জগদ্ধাত্রীর। প্রণাম করব তাঁকে। শুনব তাঁর মুখে ঠাকুর ও মার রামায়ণী-কথা। করব তাঁর চোখ দিয়ে হরগৌরীর দিব্যজীবন দর্শন।

অহৈতুকী কৃপা-সিন্ধু ঠাকুর। অন্তর্যামী। নিশ্চয়ই শুনেছেন দীনা ভিখারিনীর আর্তকণ্ঠের করুণ প্রার্থনা। তাই টেনে নিয়ে চলেছেন বাবা বিশ্বনাথের দরবারে—মা অন্নপূর্ণা যেখানে রাজরানী।

বারাণসী স্টেশন থেকে সোজা হাজির হলাম আমরা, রামকৃষ্ণ-মিশন সেবাশ্রমে। বেলা তখন প্রায় তিনটে। সেক্রেটারি মহারাজের চরণ বন্দনার পর .স্বামী বার করলেন পূজনীয় চন্দন মহারাজের পরিচয় পত্রখানি।

প্রবীণ সাধু ভাস্বরানন্দ মহারাজ সাদরে গ্রহণ করলেন আমাদের দুজনকে। প্রাণঢালা আশীর্বাদে ধন্য হলাম আমরা। এলাম অতিথি ভবনে।

শীতের বেলা। সন্ধ্যার আর দেরি নেই। ঘরে চাবি এঁটে বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। ঠাকুর-মন্দিরে প্রণাম সেরে তাকাই নাটমন্দিরের দিকে। উৎসবের সাজসজ্জায় নাটমন্দির জমজমাট। জনৈক সাধুর কৃপায় জানলাম, পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের জন্মতিথি আজ। সন্ধ্যায় বসবে ভজনের আসর। তারই তোড়জোড় চলছে।

আনন্দের দোলায় দুলে উঠল মন। এমন এক বিশেষ দিনে আসতে পেরেছি জেনে ঠাকুরের উদ্দেশে প্রণতি জানালাম।

'কোথা ব্রজবালা কোথা বনমালা' কিছুই জানি না। শুধু জানি বসুমতী-মা থাকেন বারাণসীতে। শরণ নিলাম এক মহারাজের। সস্নেহ ভাষণে বুঝিয়ে দিলেন, 'তোমরা যাবে ঔরঙ্গাবাদে। রিকশা-ওয়ালাকে বলবে, বম্-পুলিসের চৌকীর আগে। সামনে দেখবে দুদিকে ফাঁকা মাঠ। মাঝামাঝি পড়বে লাল দোতলা বাড়ি··· 'রামাবাস'। বাড়ির সামনে বাগান—ফুলে ফলে ভরা। আর দেরি ক'র না। সন্ধ্যার আগে ফিরে এস। ভজন শুনবে।'

সাধুর আদেশ। সেবাশ্রমের গেট পেরিয়ে রিকশা নিলাম। পথ নির্দেশ এমনি নিখুঁত, খোঁজ নেবার প্রয়োজন হল না।

ক্ষুদ্র বেষ্টনীর মধ্যে সাজানো বাগান। লতায় পাতায় ফুলের মেলা। ফুল ও ফলের গাছ সহবস্থানের ভিত্তিতে তপোবনের শোভায় শান্ত সমাহিত। মাধবীলতার কুঞ্জে মুনিয়া পাখিরা কলকল করে অভ্যর্থনা জানাল আমাদের। এক চিলতে সরু রাস্তা বাগানের মাঝখান দিয়ে সোজা হাজির হয়েছে বাড়ির সদর দরজায়।

নিঃশব্দ গতিতে দুজনে চলেছি। বাগানে ছিল মালী। জানতে চাইল আমাদের উদ্দেশ্য। বললাম। দাঁড়াতে বলে, উঠে গেল সে দোতলার সিঁড়িতে। অল্পক্ষণ পরে পেলাম সবুজ নিশান। সিঁড়ি ভেঙে এলাম আমরা দোতলার বারান্দায়।

মনে পড়ল ঠাকুরের সাধনভূমি দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর কথা। 'রামাবাসে' এ আমরা কাকে দেখছি! ইনি কি কামারহাটির ব্রাহ্মণী গোপালের মা !! বসুমতী-মার সাধনতীর্থে এ আমার কী অপূর্ব দর্শন। মার চরণে লুটিয়ে পড়লাম আমরা দুজনে। চরণ ধূলির আশায় উনি গড়াগড়ি দিলেন মার চরণ প্রান্তে।

জীবন ধন্য। জন্ম সার্থক আমাদের। পবিত্র দর্শনে আনন্দের উৎস শতধারায় প্রবহমান।

মার কণ্ঠে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

'কে কে তোমরা ?'

স্বামী উত্তর দিলেন। শুনতে পেলেন না মা। বার্ধক্যের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে আছেন মা আমার। কিন্তু কি সতেজ কণ্ঠ। আবার সেই একই প্রশ্ন।

'কে কে তোমরা ?

এবার আরো জোরে স্বামী বলতে চাইলেন। মা শুনতে পেলেন না। বললেন, 'কানে একদম শুনতে পাই না। শোনার যন্ত্রটা খারাপ হয়ে গেছে। ওরা নিয়ে গেছে কলকাতায়।'

আমার দিকে তাকিয়ে মা বললেন,

'জানলায় স্লেট আছে, নিয়ে আয়।'

খড়ি ও স্লেট নিয়ে এলাম। দিলাম স্বামীর হাতে। তারপর শুরু হল অবিরল প্রশ্নবর্ষণ। মা বলছেন আর স্বামী শোনাচ্ছেন লিখে লিখে।

'কে তোমরা ?'

আমাদের দুজনের নাম লিখলেন স্বামী। আরও লিখলেন, আমরা দুজনেই পূজনীয় কালীকৃষ্ণ মহারাজের সন্তান।

'কোথা থেকে আসছ ?'

'টালিগঞ্জ থেকে।'

খড়ি দিয়ে লিখছেন স্বামী স্লেটের ওপর। মা দেখছেন এক নিমেষে, আবার শুরু করছেন।

'কবে এসেছ ?'

স্লেটে দাগ পড়ল, আজই এসেছি বেলা তিনটার সময়। উঠেছি সেবাশ্রমে।

'কেন এসেছ ? ছেলেমেয়েরা কোথায় ?'

স্বামী জানালেন, 'আপনাকে দেখতে এসেছি। ছেলেমেয়েদের আনিনি। শুধুমাত্র আপনার দর্শন পেতে ছুটে এসেছি।'

প্রসন্ন হল মার মুখ। অজস্র বলি-রেখাঙ্কিত আননে ফুটে উঠল স্নিগ্ধ জ্যোতি। বললেন, 'আমাকে কি দেখবে। যাও, বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে। দর্শন কর পূজা দাও, ধন্য হবে।'

স্বামী লিখে চলেছেন, 'এবারে এসেছি আপনার কাছে। আপনার মুখে শুনব আমরা, ঠাকুরের ও মার কথা। আপনি তাঁদের দেখেছেন, তাঁদের কত কৃপা পেয়েছেন।'

মা এড়িয়ে গেলেন ও প্রসঙ্গ। আবার প্রশ্ন, 'কার কাছে শুনলে আমার কথা ?'

স্বামী জানালেন, 'আমার এক দাদা, নাম সুনীল। এসেছিলেন আপনার কাছে। দু-মাস আগে।'

অনেক চেষ্টা করলেন মা। নামটা স্মরণে এল না।

'তোমার বাবা আছে ? মা ?'

'মা নেই।'

স্বামী লিখছেন স্লেটের ওপর।

'বাবা আছেন।'

নাম লিখলেন বাবার। আরও লিখলেন,

'বাবা শ্রীশ্রীমার সন্তান।'

'কি বললে?'

পরিস্থিতিটা আমূল বদলে গেল। মার মুখে আর কোনো ঘরোয়া প্রশ্ন নেই। আটানব্বই বছরের বৃদ্ধা এক নিমেষে ফিরে পেলেন, ফেলে আসা তাঁর পুরানো জীবন। বার্ধক্যের জরাবরণ সরিয়ে প্রকাশিত হলেন প্রাণচঞ্চলা এক মহীয়সী নারী। যিনি ঠাকুরকে জানেন বড়দাদা বলে। আর, শ্রীশ্রীমা যাঁর কাছে পরিচিতা—সারুদিদি, গাঁদাফুলদিদি।

অগ্রহায়ণ মাসের পড়ন্ত বেলা। গাছের মাথায় সূর্যের শেষ কিরণ। কাশীর বাতাসে হিমের ছোঁয়াচ। আবরণহীনা মা উত্তেজনার আবেশে নড়েচড়ে বসলেন। জীর্ণ ধুতিখানি কোলের ওপর জড় করা। ঠিক যেমনটি থাকত ঠাকুরের কোলের কাছটিতে দক্ষিণেশ্বরে—ছোট খাটটির ওপর। মা বললেন, 'কি বললে? তোমার বাবা শ্রীশ্রীমার সন্তান?'

'হ্যাঁ মা। জয়রামবাটীতে বাবা তাঁর কৃপা পেয়েছিলেন।'

'তোমার বাবার ইষ্ট দর্শন হয়েছে?'

বার বার মার কণ্ঠে ওই একই প্রশ্ন। স্বামীও লিখে চলেছেন ওই একই উত্তর। আমার মন বলছে, মা হয়ত আনতে চাইছেন অন্য কোনো প্রসঙ্গ। ইসারায় নিবৃত্ত করলাম স্বামীকে। নিরুত্তর দেখে মা আবার বললেন, 'তোমার বাবার ইষ্টদর্শন হয়েছে?'

বসে আছেন স্বামী হাত গুটিয়ে। ভাবস্থ হলেন মা। তারপর

শুরু করলেন, 'তবে শোন, তোমার বাবার ইষ্টদর্শনের কথা। বাবাকে বলবে বাড়ি গিয়ে। বলবে ত বাবা, তোমার বাবাকে তাঁর ইষ্টদর্শনের কথা?

বড় বড় অক্ষরে স্বামী লিখছেন স্লেটের ওপর।

'বলব মা, নিশ্চয় বলব আপনার কথা।'

মা শুরু করলেন,

'তেরশ বাষটি সালে সেবার পুরী গেলাম। সঙ্গী হরিপ্রেম। উঠলাম দিদিভায়ের বাড়ি। নির্মলের মা আমার দিদিভাই। সে আমাকে ডাকে দিদিভাই আর আমিও বলি দিদিভাই। নির্মলকে চেন? অধ্যাপক নির্মল বসু—খুব নাম করা অধ্যাপক।'

নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি আমরা মার মুখের দিকে। কী অপূর্ব স্মৃতিশক্তি। চোদ্দ বছর আগের ঘটনা স্মৃতিপটে আজও অম্লান।

'দিদিভাই যখন শুনল জয়রামবাটী যাব আমরা, জিদ ধরল যাবে আমাদের সঙ্গে। রাজী হয়ে গেলাম। বড় ভালবাসে আমাকে দিদিভাই। ভালই হল, সঙ্গী পেলাম আমি। পুরী থেকে আমরা সবাই এলাম জয়রামবাটী মায়ের বাড়িতে। আশ্রমের মোহান্ত খুব খুশী। থাকার ব্যবস্থা, খাওয়ার ভার সব দায়িত্ব আশ্রমের। ছুটি পেল হরিপ্রেম। এদিকে আনচান করেছে মার বাপের বাড়ির বৌ-ঝিরা। আমি বাপু ওদিকে কান দিচ্ছি না। স্নান সেরে দিদিভাইকে নিয়ে হাজির হলাম সিংহবাহিনীর মন্দিরে।'

স্বামীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন বসুমতী-মা,

'জয়রামবাটী গেছ? কামারপুকুর?'

আমরা দুজনেই ঘাড় নাড়লাম। মা তাকিয়ে আছেন স্লেটের দিকে। স্বামী লিখলেন, 'গেছি মা।'

'সিংহবাহিনীর মন্দির দেখেছ ? মাটির দেয়াল—ছনের চাল।'

স্বামী লিখলেন, 'পাকা বাড়ি হয়েছে মা— মা সিংহবাহিনীর।'

'কি দেখেছ বেদীতে ? কোন মূর্তি আছে ?'

'না মা। একটি ছোট ঘট, মাথায় ফুল-বেলপাতার অর্ঘ্য।'

'ঠিক বলেছ।'

মা যেন মিলিয়ে নিলেন। আবার ফিরে গেলেন নিজের ভাবে।

'কি ঠাকুর মা সিংহবাহিনী। একে-ওকে জিজ্ঞেস করি, কেউ বলতে পারে না। পূজা করছে গণপতি—শ্রীশ্রীমার ভাইপো। আমাকে দেখে তটস্থ হয়ে উঠল।'

'আসুন পিসিমা, ভিতরে আসুন। ওঃ কী ভাগ্য আমাদের। কতদিন পরে দেখতে পেলাম পিসিমাকে।'

গণপতি বলছে, পিসিমা। ঠিক ধরতে পারছি না আমরা। মা বললেন, 'গণপতি হল শ্রীশ্রীমার ভাইপো। আর আমারও ত আপনার লোক।'

বিস্ময়ের মাত্রা বেড়েই চলেছে। চুপ করে আছি দেখে মা বললেন, 'শ্যামাসুন্দরী আর এলোকেশী দু-বোন। শ্যামাসুন্দরীর মেয়ে শ্রীশ্রীমা আর এলোকেশীর মেয়ে আমি। সেই সুবাদে ওরা আমায় ডাকে পিসিমা।'

দিনের আলো দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে। স্লেটের লেখা নজরে আসছে না মায়ের। আলোর সুইচটা আমায় দেখিয়ে দিলেন। এর মধ্যে বাগানের সেই মালী দুবার ঘুরে গেছে। আবার সে এল। নজরে পড়তে মা বলে উঠলেন, 'এখন যা। এদের সঙ্গে কথা বলছি।'

ফিরে গেল সে।

মা বলে চললেন আগ্রহ ভরে :

'গণপতিকে বললাম,—হ্যাঁরে গণপতি সিংহবাহিনী কি ঠাকুর র‍্যা ? গণপতি বলে,—সে পিসিমা বড় জাগ্রত ঠাকুর। কত লোক আসে দূর দেশান্তর থেকে। কারুর অঙ্গুল খসে যাচ্ছে। কারুর পেটে শূল বেদনা। কেউ ছেলের অসুখের জন্য মানত করে। কারুর বা দুঃখের সংসার। মার কাছে হত্যা দেয়—ফুল পায়। মনের কামনা মিটিয়ে বাড়ি ফেরে।

'তা ত বুঝলাম। কিন্তু কি ঠাকুর মা সিংহবাহিনী, তাই বল না।'

...গণপতি মাথা চুলকায়। আর গণপতিই বা কেন, মার ভাজেদের জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাদেরও ওই একই কথা। বড় মোহন্তকে শুধালাম, সেখানেও ভাসা ভাসা উত্তর। কি ঠাকুর মা সিংহবাহিনী, মনের মধ্যে ওই একই প্রশ্ন।

...পূজা শেষ হল। হরিপ্রেম দাঁড়িয়ে আছে, নিয়ে যাবে আমাদের আশ্রমে। গণপতি ছাড়ে না। বলে, 'আর একটু থাক না পিসিমা। বৌ আসছে, প্রণাম করবে তোমাকে।'

...ফিরে গেল হরিপ্রেম। গণপতি পৌঁছে দিয়ে আসবে আমাদের দুজনকে। এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। বৌ আসছে না দেখে গণপতি গেল বৌকে ডেকে আনতে।

দিদিভাই বসে আছে মন্দিরের বাইরে—দালানে। যত ডাকি, 'এস না দিদিভাই মার কাছে।'

বলে, 'না দিদিভাই। আমরা কায়েত। বাইরে বেশ আছি।'

...মার সামনে বসে আছি, একা। কথা বলছি মায়ের সঙ্গে।

'মা সিংহবাহিনী তুমি কে মা। ওমা, তুমি ত সিংহবাহিনী, তুমি কে মা। মাগো সিংহবাহিনী বল না মা তুমি'...

...হঠাৎ কোন এক মধুর গন্ধে ভরে উঠল মার মন্দির। বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে সারা ঘর আলোয় আলো হয়ে গেল। যেখানে বসানো

ছিল মায়ের ছোট ঘটখানি তা আর দেখতে পেলাম না। দেখি এক জ্যান্ত সিংহ! হ্যাগো, দুটো কান নড়ছে। লেজটাও নড়ছে। আর সিংহের পিঠে বসে আছেন জগদ্ধাত্রী! লাল টকটক করছে গায়ের রঙ।

'ওমা, তুমিই সিংহবাহিনী। হ্যাঁ মা সিংহবাহিনী, তুমি জগদ্ধাত্রী !! মাগো জগদ্ধাত্রী, তুমিই সিংহবাহিনী !!!'

একি! চোখের পলক পড়তে না পড়তে দেখি জগদ্ধাত্রী নেই। বসে আছেন মা দুর্গা দশভুজা সিংহের পিঠে।

'ওমা সিংহবাহিনী, তুমি জগদ্ধাত্রী আবার তুমিই দুর্গা। তুমি কত রূপ ধর মা।'

···বেশীক্ষণ নয়। বোধহয় দু-একমিনিট। তারপর! দুর্গাও নেই জগদ্ধাত্রীও নেই। সিংহাসন আলো করে বসে আছেন আমার সারদা-মা। চুলগুলি সেই একই ভাবে ছড়িয়ে আছে বুকের ওপর।

'মা মাগো! তুমি সারদা, তুমি সিংহবাহিনী, তুমি জগদ্ধাত্রী আবার তুমিই দুর্গা। ও আমার সারুদিদি, ও আমার গাঁদাফুল দিদি, তুমি ত মা সারদা! তুমি জগদ্ধাত্রী !! তুমি আবার দুর্গা !!!'

···ওঃ! এ আমার কি আনন্দ। গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলাম মাকে। মাথা তুলে দেখি মা নেই। নেই সিংহের পিঠে জগদ্ধাত্রী। নেই আমার দশভুজা দুর্গা।

···যেমন ঘট ছিল তেমনি বসানো আছে বেদীর ওপর। মন আমার ভরে উঠল কানায় কানায়। সিংহবাহিনী কে, মা আমায় জানিয়ে দিলেন, নিজে দেখা দিয়ে। বলতে হবে সকলকে। জানিয়ে দেব তাদের, যারা না জেনে মার মন্দিরে হত্যা দিয়েছে। মার আশীর্বাদী নির্মাল্য ধারণ করে সফল করেছে তাদের মনোবাসনা।

···পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, দিদিভাই উপুড় হয়ে পড়ে আছে

চৌকাঠের ওপর। ডাকি, 'দিদিভাই, ও দিদিভাই। দিদিভাই, ও দিদিভাই।'

…সাড়া পাই না দিদিভায়ের। আবার ডাকি, 'দিদিভাই, ও দিদিভাই।'

…কেবলি ডাকি। দিদিভাই ওঠেও না আর সাড়াও দেয় না। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলল দিদিভাই। চোখ ভেসে যাচ্ছে অশ্রুজলে।

'হ্যাঁ দিদিভাই, তুমি কিছু দেখেছ?'

বোবার মতন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকল নির্মলের মা। কিছুক্ষণ সময় লাগল সামলে নিতে। আমার আর তর সয় না। আবার বলি,

'হ্যাঁ দিদিভাই, কিছু দেখেছ?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল নির্মলের মা।

'কি দেখেছ দিদিভাই।'

দু-ঠোঁটে আঙুল চেপে ইসারা করল নির্মলের মা। পরে বলল,

'স্বপ্নদর্শন আর দেবদর্শন বলতে নেই। তারপর দিদিভায়ের সে কি কান্না। কেবলি কাঁদে আর বলে, জীবন আমার ধন্য হল তোমার কল্যাণে।'

আবার বলে, 'দিদিভাইগো, ভাগ্যি আজ তোমার সঙ্গে এসেছিলাম তাই ত খালি চোখে দেখা পেলাম মায়ের দিব্যরূপ।'

গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিই নির্মলের মায়ের। কান্না আর থামতেই চায় না। অনেক করে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সামলাবার চেষ্টা করি। এমন সময় এল গণপতি। বৌ আছে সঙ্গে।

বড় গরীব ওরা। আয় বলতে দু-চারঘর যজমান। ধান চালের ভরসাও নেই। মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারল না পিসিমার কাছে, তাই বৌকে ডেকে আনল গণপতি।

গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করল বৌ, আমাকে। তারপর শুরু

করল দুঃখের পাঁচালি। গণপতি নিজেও মুখ্যু, আর ছেলেগুলোকেও পারছে না লেখাপড়া শেখাতে। কোথায় পাবে মাহিনার টাকা আর কোথায় বা বই-পত্তর। পিসিমা যদি ভার নেয় অন্তত একটা ছেলের।

আমার কাছে টাকা কোথা? এসেছি হরিপ্রেমের সঙ্গে। আমার ভার সেই বইছে। আঁচলের খুঁটে বাঁধা ছিল দশ টাকার একখানা নোট। দিলাম বোয়ের হাতে। নির্মলের মা দিল পঞ্চাশ টাকা।

বলল, 'মার মন্দিরে বসে কবুল করব না মা। কখন কোথায় থাকি ঠিক নেই। মাসে মাসে নির্দিষ্ট করে টাকা পাঠানো হয়ত হবে না।'

ওদিকে ডাকের পর ডাক আসছে আশ্রম থেকে। শেষে হরিপ্রেম নিজেই হাজির।

'দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। বড় মোহন্ত বসে আছেন আপনাদের জন্য।'

আহা! হরিপ্রেমের মুখটিও শুকিয়ে গেছে। দিদিভাইকে নিয়ে উঠলাম। গণপতিকে বললাম, 'যা গণপতি, বৌমাকে নিয়ে যা। তোদেরও ত খাওয়া হয়নি। আমরা হরিপ্রেমের সঙ্গে ফিরছি।'

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উতরে গেছে। বার তিনেক ঘুরে গেছে মার পরিচারক। আদুড় গায়ে বসে আছেন মা। একইভাবে পড়ে আছে কাপড়ের পুঁটলিটা মার কোলের কাছে।

মার কণ্ঠে সরস্বতী আবির্ভূতা। স্রোত বয়ে চলেছে সুরধুনী-সম সাগরসঙ্গমে। এ গতি রোধ করবে কে? পরিচারক আবার এল। একটু রাগতস্বরে মা বললেন, 'তুই যা। এদের সঙ্গে কথা বলছি।'

অস্বস্তি আমারও হচ্ছে। ঠাণ্ডা পড়েছে বেশ জাঁকিয়ে। মাকে আর বাইরে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। স্বামীকে বললাম উঠতে।

'মা, এবার আমরা ফিরব।'

স্বামী বললেন বেশ চেঁচিয়ে। শুনতে পেলেন মা। কিন্তু ইচ্ছা নেই আমাদের ছাড়তে।

'আমার যে এখনও বলা শেষ হয়নি।'

মার কণ্ঠে ফুটে উঠল বেদনার আভাস।

'আমরা কালকের দিনটাও আছি।'

স্বামীর উত্তরে মা খুব খুশী। বললেন, 'কাল সকাল সকাল এস। অনেক কথা বলতে হবে।' পরক্ষণেই হতাশায় ডুবে গেলেন মা।

'ক'টা কথাই বা বলব। ওকি আর বলে শেষ করা যাবে। তিনটার সময় আসবে কাল।'

মার কণ্ঠে আদেশের সুর।

'এখন যাও বিশ্বনাথের মন্দিরে। আরতি দেখে এস।'

সন্ধ্যা হলেই মার মুশকিল। স্লেটে লেখা দেখতে পান না। খুব জোরে বলতে হয়। তাতেও সব শুনতে পান না।

অনেক করে বোঝাতে হল, আমরা আজ যাব না মন্দিরে। সেবাশ্রমে আজ রাত্রে ভজনে অংশগ্রহণ করব আমরা। পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি আজ।

'তবে কাল সকালে গঙ্গাস্নান সেরে মন্দিরে যাবে। কাল চতুর্দশী···।'

কোন্ চতুর্দশী, কিছুতেই মনে এল না মায়ের। অনেক চেষ্টা করলেন। আবার বললেন, 'কাল বিশ্বনাথের প্রতিষ্ঠা দিবস। মস্ত বড় যোগ। পুজা দেবে বাবার। সন্ধ্যায় আবার যাবে ঘি'য়ের বাতি দিতে। আরতি দেখবে।'

দুজনে প্রণাম করে মাকে, নিচে এলাম। গভীর প্রশান্তি দেহে মনে মিশিয়ে আছে ধূপের ধোঁয়ার মতো। নিঃশব্দে হাঁটছি আমরা

বাগানের মধ্যে। হঠাৎ মনে হল, আর একবার দেখে নিই মাকে। মুখ তুলে তাকালাম উপরের বারান্দায়।

দু-হাতে বেড় দিয়ে ছোট শরীরটাকে তুলে নিয়েছে মালী, বুকের মাঝখানে। মা যেন পাঁচ বছরের শিশু।

…তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্য প্রভাতে আজি। ব্রাহ্ম মুহূর্তে বিশ্বপিতার চরণে অর্ঘ্য দিলাম সুরের অঞ্জলি। আজ সাতই অগ্রহায়ণ। গুরু নানকের পঞ্চশত জন্মশতবার্ষিকী। আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে শিখ সম্প্রদায় সারা ভারতে। সেবাশ্রমের পশ্চিমদিকে অতিথি-ভবনের অপর পার্শ্বে রচিত হয়েছে বিরাট প্যাণ্ডেল। উৎসব শুরু হয়েছে গত কাল। ভজন পাঠ, বক্তৃতা একের পর এক অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুষ্ঠু পরিকল্পনায়। অবিশ্রান্ত ধারায় বয়ে চলেছে ভক্তির ঝরনা।

কাশীতে তিনদিনের মেয়াদ। শনিবার কেটে গেছে। যা পাবার কুড়িয়ে নিতে হবে আজকের মধ্যে। কাল বাজবে বিসর্জনের বাজনা।

প্রবীণ সাধুদের প্রাতঃপ্রণাম সেরে এলাম সেবাশ্রম অফিসে। খাজাঞ্চী মহারাজ স্বামী নিত্যানন্দ, ভার নিয়েছেন আমাদের দেব দর্শনের। বললেন, 'সংবাদ দিয়েছি বেণীমাধবকে। এখনি এসে পড়বে।'

বেণীমাধব সেবাশ্রমের পাণ্ডা। বিশ্বনাথের প্রধান পুরোহিতের ভাইপো। এদিকে বেলা বেড়ে যায় দেখে, মহারাজ আবার লোক পাঠালেন বেণীমাধবের খোঁজে। লোক ফিরে এল। বেণী না আসায় চিন্তিত হলেন মহারাজ। বললেন, 'ভোর চারটায় যখন যাই গঙ্গাস্নানে, দেখি, কাতারে কাতারে লোক চলেছে গঙ্গার ঘাটে। আজ কার্তিক পূর্ণিমা, তাই এত ভিড়। গাড়ি যাবে গোধুলিয়া

পর্যন্ত। দশাশ্বমেধ ঘাটে নামবার চেষ্টা করবেন না। লক্ষ লক্ষ লোকের ভিড় পারবেন না সামলাতে। পাশেই শীতলা ঘাট। ভিড়ও কম।'

ঘড়িতে তখন সাড়ে সাতটা। শীতের কামড়ে আজ ধার কম। রিকশা যত এগুচ্ছে ভিড়ের চাপও বাড়ছে। গোধুলিয়া যাবার আগেই নামতে হল রিকশা থেকে। জনসমুদ্রের মধ্যে পথ কাটিয়ে নামলাম শীতলা ঘাটে। অবগাহন স্নানে তৃপ্ত হল দেহ-মন।

স্বস্থানে পেলাম বেণীকে। পুলিসের বেষ্টনী ভেদ করে নিয়ে চলল বেণী আমাদের নিয়ে বিশ্বনাথের গর্ভগৃহে।

সত্যং শিবং সুন্দরম-এর দর্শন ও পবিত্র স্পর্শে জীবন হল ধন্য, জন্ম সার্থক, কুল-পবিত্র আর স্বর্গতা জননী হলেন কৃতার্থা।

ফেরার পথে কৃপা পেলাম মা অন্নপূর্ণার। বসুমতী-মার নির্দেশ, সন্ধ্যারতি দেখার—ঘিয়ের বাতি জ্বালাতে হবে। বললাম স্বামীকে। শুনল বেণীমাধবও। বলল, 'সব ব্যবস্থা করে দেব।'

বেণীর উৎসাহ আমাদের দ্বিগুণ। পাণ্ডাপ্রণামী খুশী করেছে বেণীকে। বলল, 'এত ভিড় হয়েছে কেন জানেন? বৈকুণ্ঠ চতুর্দশী ছিল আজ সকাল দশটা পর্যন্ত। বছরে মাত্র একটি দিনে বিল্বপত্রের বদলে তুলসীপত্রে অর্ঘ্য দেওয়া হয় বাবাকে। বৈকুণ্ঠের নারায়ণ আজ পূজা পান কাশীশ্বর বিশ্বনাথের জ্যোতির্ময় লিঙ্গরূপে। তাছাড়া, আজ বাবার প্রতিষ্ঠা দিবস।'

কিছুদিন আগে পেয়েছিলাম আমরা পূজনীয় মহারাজ স্বামী চন্দ্রানন্দের পূত সঙ্গ আমাদের বাড়িতে। বসুমতী-মার দর্শনের বাসনা নিবেদন করেছিলেন আমার স্বামী, মহারাজের কাছে।

আগুনে যেন ঘি পড়ল। মহারাজের সে কী অপার আনন্দ

বসুমতী-মার নাম কীর্তনে। স্মৃতির সৌরভে ঘর ভরে উঠল। ভাসিয়ে নিয়ে চলল আমাদের, তাঁরই সঙ্গে, তাঁরই স্মৃতিরেখার উজান বেয়ে—কাশীতে, বোম্বাই-এর ধারে, জব্বলপুরের ঠাকুর-মন্দিরে। বসুমতী-মার দিব্য-দর্শনের কত অলৌকিক কাহিনী বলে শোনালেন মহারাজ। আমাদের চোখে পলক পড়ে না।

আবার লঘু পরিহাসের কত ঘটনা শোনালেন মহারাজ। বসুমতী-মার স্মৃতিচিত্রণে। বললেন, 'একদিন মাকে বললাম, আর কেন মা। অনেক দিন ত বাঁচলেন। মরতে ইচ্ছা হয় না ?'

সমান তালে মা উত্তর দিলেন, 'মরতে চাইব কেন ? কোনদিন নিজের জন্য ঠাকুরের কাছে কিছুই চাইনি। রাজপুত্রের মতো স্বামী পেয়েছি। ধর্মপ্রাণ ছেলে দিয়েছেন আমায়। চাঁদের দুলালকে পাঠিয়েছেন নাতি করে। একে একে এসেছে তারা আবার কর্মশেষে ফিরে গেছে তাঁর কাছে। যখন যেভাবে রেখেছেন, সেইভাবেই আছি। ডাক পড়লেই চলে যাব।'

আরও একটা প্রশ্ন করেছিলেন মহারাজ, বসুমতী-মাকে।

'হ্যাঁ মা, এখনও দেখতে পান ঠাকুরকে স্বদেহে ?'

মা বলেছিলেন, 'না বাবা, এখন আর রূপে তিনি ধরা দেন না। তবে আনন্দের ঘট হয়ে তিনি আছেন সর্বক্ষণ হৃদয়বেদীতে।'

প্রসঙ্গ আর শেষ হতে চায় না। হঠাৎ ভাবান্তর লক্ষ্য করলাম আমরা মহারাজের কণ্ঠে। প্রবল বেগে উৎসাহিত করতে চাইলেন মহারাজ, আমার স্বামীকে। বললেন, 'মনে যখন বাসনা হয়েছে আর দেরি করবেন না। শিবরাত্রির সলতে জ্বলছে টিমটিম করে। যে কোনো মুহূর্তে নিভে যাবে দমকা হাওয়ায়। আপসোসের আর সীমা থাকবে না। ওই একটি যোগসূত্র এখনও ধরে আছেন ঠাকুর আমাদের কল্যাণের জন্য।'

শুধু কথায় নয় কাজেও। মহারাজের চেষ্টায় যোগাযোগ হল পূজ্যপাদ স্বামী ভাস্বরানন্দ মহারাজের সঙ্গে। আর তাঁরই আশীর্বাদে এই মণিকাঞ্চন যোগ।

আরও একটি প্রসঙ্গ তুলেছিলেন আমার স্বামী, মহারাজের কাছে।

'কেদারঘাটে রাজাবাবুদের বাড়ি গেছেন মহারাজ ? ঠাকুরের চরণ পাদুকা রক্ষিত আছে যেখানে—'

নিরুত্তর রইলেন মহারাজ কিছুক্ষণ। পরে বললেন, 'কিছু শুনিনি ত।'

স্বামী শোনালেন, 'আমার এক দাদা ঘুরে এলেন সেদিন কাশী থেকে। তার কাছে শুনলাম, ঠাকুরের চরণ-পাদুকা নিত্য পূজিত হন রাজাবাবুর দেবালয়ে।'

পরিহাসপ্রিয় স্বামীজী অনবদ্য ভাষায় শোনালেন এক উপাখ্যান। 'মাঝে মাঝে শোনা যায়, যে কাষ্ঠফলকে মহামতি যীশুকে ক্রশবিদ্ধ করা হয়েছিল তার অংশবিশেষ রক্ষিত আছে বেথেলহেমের গির্জায়। নতারদমের গির্জাও দাবি করে তারাও পেয়েছে ওই কাষ্ঠফলকের অংশবিশেষ। সেন্টপল গির্জারও ওই একই দাবি। শুধু এরাই নয়, পৃথিবীতে যেখানে যত গির্জা আছে সবাই বলে ওই একই কথা। হিসাব করে দেখা গেল, পবিত্র ক্রশের ওই সব অংশ যদি এক জায়গায় জড় করা হয় তাহলে স্বচ্ছন্দে বিশহাজার টনের একটা জাহাজ তৈরি হয়ে যাবে।'

একযোগে সবাই আমরা হেসে উঠলাম। লজ্জা পেয়েছে দেখে মহারাজ বললেন আমার স্বামীকে, 'যাচ্ছেন যখন, ভাল করে খোঁজখবর নিয়ে আসুন। আমায় নিশ্চয়ই জানাবেন।'

…খাজাঞ্চী মহারাজ স্বামী নিত্যানন্দ বলে দিয়েছেন আজ সকালে।

'বেণীকে বলবেন। নিয়ে যাবে রাজাবাবুর বাড়ি কেদারঘাটে। আপনারা নতুন লোক, হয়ত ঘুরতে হবে অনেক। তাছাড়া, বাড়ির নম্বরটাও আমার জানা নেই।'

বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শনের পর কথাটা তুললেন আমার স্বামী বেণীর কাছে। বেণীরও ওই একই উত্তর।

'আপনারা নতুন লোক। খুঁজে পাবেন না।'

স্বামী চাইলেন বেণীকে সঙ্গে নিতে। বেণী বলে, 'অনেকটা দূর। সময় লাগবে অনেক।'

স্বামীর ইচ্ছা বেণীও চলুক আমাদের সঙ্গে রিকশায়। পৌঁছে দিয়ে আমাদের, সে ফিরে আসবে ওই একই রিকশায়। সায় দিল না বেণী এ প্রস্তাবে।

যাত্রীর দল গিসগিস করছে পথে-ঘাটে, বিশ্বনাথের গলিতে, মন্দির প্রাঙ্গণে। এ সুযোগ ক'দিনই বা পায় বেণীরা। এ-অবস্থায় যত শীঘ্র আমাদের নামাতে পারে ওর ঘাড় থেকে ততই ওর মঙ্গল।

আমাদের সঙ্গে এল বাঁশফটক রোডে। ডাকল এক রিকশাওলা। বুঝিয়ে দিল ওর ভাষায় সওয়ারী নামবে কোথায়। আরও বলে দিল, কেদারনাথ দর্শন করিয়ে ফিরিয়ে আনবে আমাদের সেবাশ্রমে। মায়, ভাড়া চুক্তিও করিয়ে দিল।

রিকশায় বসে দেখি বেণী নেই। ভিড়ের মাঝে কোথায় মিশে গেছে।

বহু ভিড় কাটিয়ে অনেক রাস্তা পেরিয়ে রিকশা ঢুকল কেদার-ঘাটের গলিতে। দু-পাশে সারু সার বাড়ি, একতলা দোতলা। মাঝে গলি, গেছে এঁকে বেঁকে। নেমপ্লেটে দেখছি মুখার্জি, বোস, বিশ্বাস। মেয়েরা যাচ্ছে স্কুলে, মুখে বাংলা কথা। কর্তারা চলেছেন বাজার

সেরে। হাতে থলি—গলা বাড়িয়ে আছে লকলকে পালং শাক। কলকাতা কি কাশী চেনা দায়।

একটা বাঁকের মুখে স্বামী রিকশা থামালেন। সামনে এক বিরাট সাইনবোর্ড। লেখা আছে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ চরণ-পাতুকা।

ত্ব'হাত জড় করে প্রণাম জানালেন স্বামী পরম পুরুষের উদ্দেশে।

ভগ্নপ্রায় বিরাট অট্টালিকা। সিংদরজার সিঁড়ি উঠে গেছে গলির বুক থেকে। প্রায়ান্ধকার একতলায় অসংখ্য ঘর। বহু বৃদ্ধার একক সংসার। মেঝের সিমেণ্ট বহুকাল উঠে গেছে। নোনাধরা দেয়ালে দেখা যাচ্ছে সেকালের পাতলা ইটের গাঁথুনি। মৃত্যুশীতল নীরবতায় ডুবে আছে সারা বাড়িটা :

বোবার মতন দাঁড়িয়ে আছি ত্ব'জনে। কাউকে পাই না, জানব কোথায় সেই চিরঈপ্সিত চরণ-পাতুকা ?

ওঁকে রেখে আমি এগিয়ে গেলাম। এক প্রৌঢ়া বেরিয়ে এলেন। বললাম। ধীর শান্ত পদক্ষেপে নিয়ে এলেন আমাদের দোতলার সিঁড়ির সামনে।

জনশূন্য দোতলায় তপোবনের শান্তি। দেওয়ালে দেখছি ঠাকুরের বিভিন্ন রূপের ছবি। কোথাও তিনি মা ভবতারিণীর আদরের গোপাল। কোথাও তিনি আছেন দাঁড়িয়ে, সমাধিভূমিতে। মুখে তাঁর স্বর্গীয় জ্যোতি। ওষ্ঠে ভুবন-ভোলানো মৃত্যু হাসি। আবার কোথাও দেখছি তাঁকে পঞ্চবটী মূলে ধ্যানরত—পাশে বয়ে চলেছে কলুষনাশিনী সুরধুনী।

মন্দিরে দরজা বন্ধ। বাইরে কেউ নেই। উত্তরের টানা বারান্দায় পাতা আছে সোফা। ত্ব'জনে বসলাম।

হঠাৎ স্বামী উঠে গেলেন দরজার দিকে। ডাকলেন আমায়।

দেখি, একটা বাঁধানো বোর্ডে লেখা আছে,···মথুরবাবুর সঙ্গে তীর্থভ্রমণে ঠাকুর যখন কাশীতে, একদিন এসেছিলেন রাজাবাবুদের বাড়ি। টাকাকড়ি নিয়ে কথা হচ্ছিল রাজাবাবুর, মথুরের সঙ্গে। ঠাকুর কেঁদে কেঁদে মাকে বললেন, 'এ আমায় কোথায় তুই আনলি মা। এলাম তীর্থ করতে, এখানেও টাকার কথা'—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। ২য় ভাগ (১০ম সং) ৪র্থ পৃষ্ঠা···

এই সেই রাজাবাবুর বাড়ি। সে রাজাও আজ নেই আর নেই তখনকার সেই ঠাট-বাট। আছে শুধু ভগ্ন-জীর্ণ কঙ্কালসার এই বাড়িখানা আর আছে তাঁরই চরণস্পর্শিত পবিত্র কাষ্ঠপাদুকা।

অর্গলমুক্ত হল দ্বার। শুচিস্নিগ্ধা শ্বেতবসনা এক নারী অভ্যর্থনা জানালেন আমাদের। বললেন, 'আসুন দিদি, ভিতরে আসুন।'

ভদ্র-মহিলার কণ্ঠে কী মধুর আত্মীয়তা। মনে হল যেন কত কালের পরিচয়। অপরিচিতের কুণ্ঠা উধাও হল এক নিমেষে।

চন্দনকাঠের বিরাট এক পালঙ্কে বসে আছেন ঠাকুর। ডানে বলরূপী কার্তিকেয় স্বামী বিবেকানন্দ। বামে, সারদা সরস্বতী জগদ্ধাত্রী।—স্বামীজীর ভাষায় জ্যান্তদুর্গা। সামনে বসানো আছে ছোট এক জলচৌকী মর্মরপ্রস্তরে আবরিত। তারই উপর শোভা পাচ্ছে ঠাকুরের চরণধন্য কাষ্ঠপাদুকা। ফুলচন্দনে লীলায়িত।

প্রতিটি দেওয়ালে ছবির পসরা। যীশুকোলে মেরীমাতা। যশোদাবক্ষে নীলমণি। শিশু রামচন্দ্র গান শুনছেন বৃদ্ধ তুলসীদাসের। বাৎসল্য ভাবের লীলাক্ষেত্রে বসে আছেন চন্দ্রা-তনয় শিশু গদাধর। নয়ন-ভুলানো রূপ দেখে আশা আর মেটে না।

ভক্তিনম্র প্রণামে সমর্পিত হলাম আমরা ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে। সর্ব-ইন্দ্রিয় দিয়ে গ্রহণ করলাম তাঁর আশীর্বাদ। বুক ভরে নিশ্বাস নিলাম তাঁর অঙ্গসৌরভ। পবিত্র হল দেহ মন প্রাণ।

স্বামীর ইচ্ছা চরণপাদুকার স্পর্শ পাবার। দিদি বললেন, 'নিশ্চয়ই। ভক্তির অর্ঘ্য এনেছেন আপনারা। তিনি কি শুধু আমার একার।'

গঙ্গাজলে শুদ্ধ হয়ে আমরা এগিয়ে এলাম। কপাল ঠেকিয়ে পরশ নিলাম পবিত্র পাদুকার। থরথর করে কেঁপে উঠল সারা শরীর।

পাগলাঝোরা নেমে আসছে স্বামীর দু'চোখ বেয়ে। তৃষিত বক্ষে আনন্দের এ কী নিদারুণ আলোড়ন!

...ফিরে এসেছি বসুমতী-মার স্নেহনীড়ে। মা বসে আছেন রোদে পিঠ দিয়ে। আজ একটু সাজগোজ হয়েছে মায়ের। শ্রীঅঙ্গে ধুতিখানি জড়ানো। পাশে পড়ে আছে একখানি কাশ্মীরী শাল।

মা বললেন, 'গেছ বাবা, বিশ্বনাথের মন্দিরে?'

আজ এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। ঠোঁট নাড়া দেখে মা বুঝতে পারছেন আমরা কি বলছি। কানের কাজ সারছেন চোখ দিয়ে। স্লেটের প্রয়োজন বাতিল হয়ে গেল।

স্বামী বললেন, 'মা, আমরা গিছলাম গোপালের মার বাড়ি।'

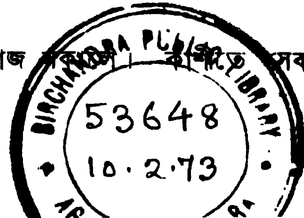
'কে গোপাল...'

মা ধরতে পারছেন না।

'কেদারঘাটে।'

নিমেষে বুঝে নিলেন মা। বললেন, 'বেশ করেছ বাবা। বড় ভাল জায়গা। আমি ছিলাম একদিন, সারা রাত। ঠাকুর স্বদেহে আছেন ওখানে। সকালে টাকা দিয়ে বললাম,—বৌমা, ভাল করে ঠাকুরকে ভোগ দিও।'

দিদির মুখে শুনেছি ওই ঘটনা আজ সকালে। কাশীতে সেবার



বড় গণ্ডগোল। রাসপূর্ণিমার সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণ—চূড়ামণি যোগ। মা এসেছেন গঙ্গাস্নানে। গ্রহণারম্ভে স্নান সেরে বসে আছেন কেদারঘাটে। মুক্তিস্নানের তখনও দেরি অনেক। দিদির ছোট ছেলে দেখতে পেল মাকে। এদিকে গণ্ডগোল বাড়ছে দেখে কর্তৃপক্ষ জারী করল কারফিউ। মা কিছুই জানেন না। কাছাকাছি চাকর-বাকরদের না পেয়ে মাকে তুলে আনল গোপাল, দোতলায়। ঠাকুর-ঘরে বসে মা মহাখুশী। ওদিকে খোঁজ খোঁজ রব উঠছে গঙ্গার ঘাটে। গোপাল জানিয়ে এল মা এখানে। মা কিন্তু নড়লেন না সারা রাত। একই ভাবে রাত কাটালেন ধ্যানে-জপে।···

'তবে শোন বাবা, তোমার বাবার ইষ্টদেবীর কথা।'

সামনে বসে আছি আমি। আমার পাশে বসে আছেন আমার স্বামী। দু'জনেই উৎকর্ণ হয়ে শুনছি।

মা শুরু করলেন, 'আশ্রমে ফেরার আগে গণপতিকে বললাম, এই নে পাঁচটা টাকা। ফুল ফল যা লাগবে কিনে আনবি। কাল এখানে পূজা হবে মায়ের। খুব ঘট' করে পূজা করতে হবে।'

চোখ কপালে তুলে গণপতি বললে, সেকি পিসিমা। একি তোমার কাশী শহর, পয়সা ফেললেই মিলবে। ফুলই বা এত পাব কোথা। দু'-চারটে গাছ আছে এর তার বাড়িতে। পূজার দিনে তারাই দিয়ে যায় একমুঠো ফুল মায়ের দোরগোড়ায়।

'ও সব কথা জানি না বাপু। যেমন করে পার যোগাড় কর। পূজা কাল করতেই হবে। আমি যাচ্ছি মোহন্তর কাছে মিষ্টির যোগাড়ে।'

হরিপ্রেমের সঙ্গে ফিরে এলাম আশ্রমে আমি আর দিদিভাই। সবাই শুকুচ্ছে। মোহন্ত বলল, 'এত দেরি করলেন মা।'

মোহন্তকে বললাম, 'বাবা তোমরা খেতে বস।'

দিদিভাইকে নিয়ে আমিও বসলাম। খাব কি পেট ফুলছে আনন্দে। দু'মুঠো খেয়ে হাজির হলাম মোহন্তর কাছে। বললাম, 'কাল মায়ের পূজা দেব বাবা। মা সিংহবাহিনীর। মিষ্টি চাই অনেক। পান্তুয়া, রসগোল্লা, জিলিপি।'

মোহন্ত যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল, 'সে কী মা! কাল পুজো, আজ বলছেন মিষ্টির কথা। এখানে ছানা কোথায় পাব মা। এদেশে কি দুধোল গরু আছে। ওই ত ছোট ছোট গরু। দুধ দেয় আধ সের কি আড়াইপো। ঠাকুরের ও মার উৎসবে ছুটতে হয় আমাদের কোতলপুরে বা বিষ্ণুপুরে। তাও কতদিন আগে থেকে ব্যবস্থা করি।'

'কোন কথা শুনব না বাবা। মিষ্টি আমার চাই-ই। যত টাকা লাগে বল হরিপ্রেমকে।'

ভাতের গ্রাস হরিপ্রেমের মুখে। মোহন্তর সঙ্গে সেও খেতে বসেছে। ইসারায়, বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল পেটে ঠেকাল। বলতে চাইল, গেঁজেতে এত টাকা নেই।

'বাবা, তুমি কিছু ভেব না। কাশী গিয়ে কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করব তোমার দেনা।'

সন্ধ্যা হল। ডাকের পর ডাক আসছে মায়ের বাড়ি থেকে। বৌ-ঝিগুলো ঘর-বার করছে দিদিভাইকে নিয়ে এলাম মায়ের বাড়ি।

হঠাৎ আমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ বাবা, মায়ের বাড়ি গেছ?'

স্বামী বললেন, 'হ্যাঁ মা, দেখেছি মায়ের বাড়ি। রাস্তার ধারে পাঁচিল দেওয়া মাটির বাড়ি। ভেতরে উঠোন। দক্ষিণ-দুয়ারী মার ঘর। বুক সমান উঁচু দাওয়া।'

'ঠিক বলেছ।'

আবার বলা শুরু করলেন মা তাঁর পুরনো কথা :

'দিদিভাই শোবে দাওয়ায়। পাড়াগাঁয়ে খুব মশা। মশারি টাঙিয়ে দিয়েছে দিদিভায়ের জন্য। আমার আবার বন্ধন সহ্য হয় না। আমি থাকলাম বসে মার ঘরটিতে। দরজাটা আড়ভেজানো। ওখানে তখনও লাইট আসে নি। একটা হ্যারিকেন টিমটিম করছে দাওয়ার ধারে। রাত হয়েছে অনেক। বসে বসে মার সঙ্গে কথা বলছি।

"হ্যাঁ মা, তুমি সিংহবাহিনী, তুমিই জগদ্ধাত্রী আবার তুমিই দুর্গা। কত রূপে তুমি আছ মা। ওমা, তুমি ত আমার সারুদিদি। তুমি দুর্গা! তুমি জগদ্ধাত্রী!! তুমি ..."

'ভবতারিণী! ভবতারিণী!! ভবতারিণী! ভবতারিণী!!'

কে ডাকছে আমায়? ঘাড় ফিরিয়ে তাকাই পিছন দিকে। না, কেউ ত নেই। দরজা বন্ধ। পাশ ফিরে তাকাই—সেখানেও কেউ নেই। আবার সেই ডাক—

'ভবতারিণী! ভবতারিণী!! ভবতারিণী! ভবতারিণী!!'

খুব চেনা গলা। গায়ে আমার কাঁটা দিয়ে উঠল। বয়ে গেল অমৃতের শিহরণ।

আমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে মা বললেন, 'পাড়াগাঁয়ে মাঠকোঠা দেখেছ বাবা? চালের নিচে মাঠগুদোম। বাঁশের মই বেয়ে উঠতে হয়।'

বার বার সেই একই ডাক, 'ভবতারিণী! ভবতারিণী!!'

আমিও পাগলের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছি। নাম ধরে কে ডাকছে আমায়। কে, কে ডাকছে!

হঠাৎ যেন বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে গেল ঘরের মধ্যে। দিব্য গন্ধে ভরে উঠল সারা ঘর।

অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছি আমি। দেখি, আমার মা-সারদা পা দুটি ঝুলিয়ে বসে আছেন ম'য়ের উপর। রূপের আভায় জ্বলজ্বল করছে মার দেহখানি। মুখে সেই মিষ্টি হাসি। সেই চোখ, সেই নাক, চুলগুলি তেমনি করে ছড়িয়ে আছে বুকের উপর।

'মা, মাগো। ওগো আমার সারুদিদি! ওগো আমার গাঁদাফুল-দিদি!! ওগো আমার মা-সারদা—'

লুটিয়ে পড়লাম মায়ের পায়ের তলায়। অনেকক্ষণ পরে উঠে বসলাম। তাকিয়ে দেখি মা নেই। সব অন্ধকার। দেহ আমার অবশ হয়ে গেছে। শরীরটা মনে হচ্ছে একটা কাপড়ের পুঁটলি।

কোথায় গেল মা। খুঁজে বার করবই। মা নিশ্চয়ই উঠে গেছেন মাঠকোঠাতে। বাঁশের সিঁড়িতে পা দিয়ে উঠতে গেলাম, পারলাম না। থরথর করছে পা-দুটো। একা হবে না। আলোটা চাই।

বাইরে বেরিয়ে দেখি, দিদিভাই উপুড় হয়ে পড়ে আছে চৌকাঠের উপর। বার বার ডাকি, 'দিদিভাই, ও দিদিভাই। দিদিভাই ও দিদিভাই।'

সাড়া নেই দিদিভায়ের। অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলল দিদিভাই।

'হ্যাঁ দিদিভাই কিছু দেখেছ?'

হাউহাউ করে কেঁদে উঠল দিদিভাই। বলল, 'সব দেখেছি দিদিভাই জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে।'

তারপর আমাকে জড়িয়ে সে কী কান্না দিদিভায়ের। বাকী রাতটুকু এইভাবে কেটে গেল।

আমার মন কেবলি বলছে, মা নিশ্চয়ই উঠে গেছেন মাঠকোঠায়। ভাল করে আলো ফুটল আকাশে। এক পা এক পা করে উঠলাম মই বেয়ে। কোথায় মা!

কতকগুলো খেজুর-চাটাই পাকানো আছে এখানে সেখানে।

আর আছে দু'একটা মাটির হাঁড়ি। কারুর মধ্যে বিচিসুদ্ধ কাপাস তুলো আর কোথাও বা কাটা তেঁতুল।'

সম্মোহিত হয়ে বসে আছি আমরা স্বামী-স্ত্রী। বসুমতী-মার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে বৈদিক স্তোত্র। নিঃশব্দ ধরিত্রী শুনছে কান পেতে। একটু বাদে মা ফিরে গেলেন তাঁর পুরনো কাহিনীতে। বলতে লাগলেন :

"মা-সিংহবাহিনীর পূজা শেষ করল গণপতি। বেলা তখন প্রায় বারটা। লোকে লোকারণ্য। পূজা শেষ হবার আগে গণপতিকে বলি, 'কিছু ফুল রেখে দিস গণপতি। মার বাড়িতে পূজা হবে।'

আরতি শেষে মুঠো মুঠো প্রসাদ বিলানো হল। ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ সবাই খুশী। খুশী গণপতিও। বহু জিনিস নিয়ে গেল তার বাড়িতে সকলকে দেওয়া-থোয়ার পর।

এবার পূজা হবে মায়ের বাড়িতে। কোশাকুশি পুষ্পপাত্র নিয়ে ঢুকছি মায়ের ঘরে। গণপতি ডাকছে উঠান থেকে।

'ও পিসিমা, ও ঘরে কেন ?'

আমি বলি, 'পূজা হবে এখানে।'

গণপতি মানতে চায় না।

'বাড়ির মধ্যে আবার পূজা কি। বাইরের ঘরে চল। সেখানে মা-জগদ্ধাত্রীর পূজা হয়। পূজা হবে সেখানে।'

আমি বলি, 'না রে গণপতি, পূজা ওখানে নয়। মার ঘরে হবে।'

কেবলি জিদ ধরে গণপতি।

'না পিসিমা, পূজা হবে বাইরের ঘরে। দলে দলে লোক আসবে পূজা দেখতে। ঘণ্টা বাজাবে, কাঁসর বাজাবে আরতির সময়।'

জিদ আমারও বাড়ে। বলি, 'আমি যা বলছি শোন গণপতি। আর কথা বাড়াস না। ভিতরে আয়, পূজায় বস।'

অভিমানে ফুঁসিয়ে ওঠে গণপতি। বলে, 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে পিসিমা। তুমি কি ভেবেছ, তোমার ওই পটের ছবি খাবে রসগোল্লা, জিলিপি!'

রাগে গজগজ করতে করতে গণপতি ঢুকল ঘরে। পূজায় বসল। দিদিভাই, আমি, বাড়ির বৌ-ঝিরা সবাই বসে পূজা দেখছি।

পূজা শেষ হল। আরতি হবে। পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে গণপতি উঠল আরতি করতে। দু'বার ঘোরাবার পর পঞ্চপ্রদীপ খসে পড়ল গণপতির হাত থেকে।

'পিসিমা গো—!

আছাড় খেয়ে পড়ল গণপতি মেঝের উপর। তারপর, সে কি আকুল কান্না গণপতির। মাটিতে মুখ ঘষছে আর বলছে, 'পিসিমা গো! এ আমি কি দেখলাম গো! পটের ছবি কি করে জ্যান্ত হল পিসিমা—এ তোমার কি দয়া গো পিসিমা। তুমি যে নিজের হাতে জিলিপি নিয়েছ, রসগোল্লা নিয়েছ। আমি যে তোমায় তাচ্ছিল্য করেছিলাম পিসিমা। পিসিমা গো, তুমি আমায় ক্ষমা কর গো।'

তারপর গড়াতে গড়াতে গণপতি এসে পড়ল আমার পায়ের কাছে। কিছুতেই বোঝাতে পারি না ছেলেটাকে। গায়ে পিঠে হাত বুলোই, চোখের জল মোছাই, বুকে হাত বুলিয়ে দিই—তবে না থামে ছেলেটা।

এদিকে দেখ আর এক কাণ্ড! সবাই উঁকি দিয়ে দেখছে। মার মুখে লেগে আছে রসগোল্লার রস!

হঠাৎ বসুমতী-মার ডাকে চমক ভাঙল আমাদের। আমার স্বামীকে বললেন এবার:

'বলবে বাবা তোমার বাবাকে। তাঁর ইষ্ট দর্শনের কথা। কি বাবা, বলবে ত তোমার বাবাকে—তাঁর ইষ্টদেবীর কথা।'

কতক্ষণ আর, বড় জোর তিন মিনিট। দেহবোধ ফিরে পেলেন মা। পায়ের কাছে পড়েছিল শালখানা। একটা খুঁট ধরে তুলে নিলেন পিঠের উপর।

নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি আমি। মার মুখে হিমালয়ের প্রশান্তি। উবু হয়ে বসে আছেন মা রেলিংয়ের ধার ঘেঁষে। হাঁটুর উপর কনুই দুটি। আঙুলগুলি ঠেকিয়ে আছেন চুলের মধ্যে। ভাবের ঘোর তখনও কাটে নি।

আমার স্বামী বলে উঠলেন, 'আপনি ত ঠাকুরকে দেখেছেন মা?'

স্বামীর প্রশ্নে মার মুখ ভরে উঠল প্রসন্ন আভায়। বললেন, 'দেখেছি কি বাবা! তাঁর কোলে-বুকে মানুষ হয়েছি যে। সম্পর্কে তিনি যে আমার দাদা। ঠাকুরের বাবা আর আমার বাবা এঁরা হলেন খুড়তুত জেঠতুত ভাই। আমার মা শেষদিন পর্যন্ত ঠাকুরকে ডাকত বড় ছেলে বলে। জান বাবা, কামারপুকুর থেকে ঠাকুর যখন এলেন দাদার টোলে, সময় পেলেই চলে আসতেন আমাদের বাড়ি। মায়ের মুখে শুনেছি, আমি তখন এইটুকু। তক্তপোশে শুইয়ে রেখে গেছে মা আমাকে। হাত ঠুকছি কাঠের উপর। পাছে আমার ব্যথা লাগে, তাই ঠাকুর, সামনে যা পেয়েছেন পুঁটলি করে ঠেলে দিয়েছেন হাতের নিচে। আরও একটু যখন বড় হয়েছি, সবে হামা দিচ্ছি, একদিন দুপুরবেলা ঠাকুর খেতে বসেছেন বড় ঘরে। হামা দিয়ে আমি একেবারে ভাতের থালার সামনে। বাঁ-হাতে আমায় ধরে আছেন ঠাকুর আর ডান-হাতে ভাত খাচ্ছেন। কি কাজে মা বেরিয়েছে রান্নাঘর থেকে। ওই অবস্থায় দেখে বাড়ির ঝিকে ডাক-

ডাকি—ওরে, হাবিকে নিয়ে যা। ছেলের আমার খাওয়া হচ্ছে না।'

'আপনাকে হাবি বলে ডাকতেন বুঝি আপনার মা ?'

প্রশ্ন শুনে মা তাকালেন স্বামীর দিকে। বললেন, 'সে কথা আর বলনা বাবা। যে যা পারত তাই বলে ডাকত। বড় দু-ভাই আর এক বোনের পর মায়ের তিনটা ছেলেমেয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তারপর আর ছেলেপুলে হয় নি। এমন কি মায়ের মাসিক পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর, আমি হলাম। সেই দুঃখে আমার নাম, মা, কিছুতেই রাখবে না। ঠাকুর একদিন জিদ ধরলেন,

—খুড়িমা হাবির একটা নাম দাও। নামের কি অভাব।

মার কিন্তু ইচ্ছা নেই। বলল, কেন বাবা, নাম দিয়ে কি বেঁধে রাখতে পারব ?

ঠাকুরও ছাড়বেন না। বললেন, 'পয়সা দিয়ে ত নাম কিনতে হবে না। তুমি যদি বল খুড়িমা, হাবির নাম আমি রাখি। তার নাম থাক ভবতারিণী।'

সেই থেকে হাবি নাম আমার ঘুচল। একটু একটু করে যেমন বড় হয়েছি ঠাকুরের স্নেহ ততই বেড়েছে। দক্ষিণেশ্বর থেকে আসতেন কলকাতায়, আগে ঢুকতেন আমাদের বাড়ি। খবর যেত রামদাদার কাছে। আমাদের বাড়ির গা দিয়ে মধুরায়ের গলি। খুব কাছেই ছিল রামদাদার বাড়ি। ওখান থেকে লোক আসত ঠাকুরকে নিয়ে যেতে। কতই বা বয়স আমার। একখানা পাঁচি-শাড়ি গাছ কোমর বেঁধে পরিয়ে দিতেন ঠাকুর। গলা জড়িয়ে বুকে পড়ে থাকতাম ঠাকুরের। নিয়ে যেতেন সঙ্গে করে। কতবার ওখান থেকে চলে গেছি দক্ষিণেশ্বরে। দু'দিন তিনদিন রাখতেন নিজের কাছে। আবার পাঠিয়ে দিতেন বাড়ি।

বিয়ে ত উনিই দেওয়ালেন। সে কি রাগারাগি বাবা।

ছ'বছর বয়স থেকে দেখাদেখি চলছে। দিদির ইচ্ছা, ওর দেওরের সঙ্গে বিয়ে দেয় আমার। আবার, বৌদির ইচ্ছা তার ভায়ের সঙ্গে বিয়ে হোক। সবাই চায় নিজের ঘরে তুলতে। ব্যাপারটা কি জান, আমার নামে কোম্পানীর কাগজ করা ছিল বিয়ের জন্য। উঃ দিদির কি হিংসা! তাল পেলেই কঁ্যাট কঁ্যাট করে কথা শোনাত। দুমদাম কিল চড় ত লেগেই ছিল।

পাড়ায় বামুন বলতে আমরা এক ঘর। সঙ্গী সাথী হয় তিলি না হয় তামলী। যেখানে যাই সবাই ভালবাসে, ভালমন্দ খেতে দেয়। টৌটৌ করে খেলে বেড়াই সারাদিন। কেউ কিছু বলে না।

বিয়ে হ'ল। শ্বশুরবাড়ি ঘুরে এলাম। আবার যেই কে সেই। পাড়ায় পাড়ায় ঘোরাঘুরি। নিমন্ত্রণ বাড়ি খেতে যাওয়া, ছাঁদা বেঁধে ঘরে আনা। কি সুখেই দিন কেটেছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ঢুকছি, শুনলাম, দাদা মায়ের সঙ্গে কি সব বলাবলি করছে। মেজদা দাঁড়িয়ে ছিল দালানে। আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, বাইরে যাবি ত তুলে আছাড় মারব। খবরদার বলছি, চৌকাঠ মাড়িয়েছিস ত দেব ঠ্যাং ভেঙে।

দাদাদের কাছে চিরকাল আদর পেয়েছি। আজ হঠাৎ এমন কি হ'ল! অভিমানে ভরে উঠল সারা মন। টপ-টপ করে জল পড়তে লাগল দু'চোখ বেয়ে।

পরে মার কাছে শুনলাম, আমার বর প্রায়ই হেঁটে যায় এই পথ দিয়ে ছাপাখানার জন্য লেখা আনতে। বোধ হয় দেখে থাকবেন। মেজদার ভয়, যদি জানতে পারে ওরা, ছেলের আবার বিয়ে দেবে।

ভয় পাবে না! আমি যে কাল, কুৎসিত। নাক থ্যাঁদা, মাথায় চুল নেই। বিছানায় নাকি প্রস্রাব করি।

হ্যাঁগো! নরেনদা, বিয়ের আগে তাই বলেছিল আমার

শাশুড়ীকে। কত করে ভ্যাংচি দিয়েছিল। কেন জান? খুব ভালবাসত আমায় নরেনদা।

আমার শ্বশুরবাড়ির অবস্থা আগে খুব ভাল ছিল না। ওখানে বিয়ে হলে খুব কষ্ট হবে আমার, এই ভেবে নরেনদা বাগড়া দিতে চেয়েছিল।

একবার আমি গেছি শ্বশুরবাড়ি। চার পাঁচ দিন হয়ে গেল ওরা পাঠাচ্ছে না আমায়। খুব কান্নাকাটি করছি। মা জানতে পেরে পাঠাল দাদাকে আমাকে নিয়ে যেতে। ওরা ছাড়ল না। মায়েরও খুব মন খারাপ। ডেকে আনল নরেনদাকে। বলল, 'যা বাবা নরেন হাবির শ্বশুরবাড়ি। বলে কয়ে নিয়ে আয় মেয়েটাকে।'

নরেনদা এসেছে। বাইরে থেকে ডাকের পর ডাক, 'ভবি, ও ভবি।'

সাড়া পেয়ে শাশুড়ী এলেন বেরিয়ে। আমিও। সেই যে নরেনদার কোঁচার খুঁট ধরেছি আর ছাড়ছি না। কেবলই বায়না,

'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

বাইরের ঘরে বসল নরেনদা। কোলের কাছে বসিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে কত কথা। শাশুড়ী বললেন, যাও বৌমা, নরেনের জন্য পান নিয়ে এস।

হায়রে কপাল। ছেলেমানুষী আর কাকে বলে। বাপের বাড়ি যেতে পারছি না। মরছি কেঁদে কেঁদে। নরেনদা এসেছে নিয়ে যেতে। এরা যদি যেতে না দেয়—। এই সব সাত-পাঁচ ভেবে মাথাটা গেল গরম হয়ে। খেঁকিয়ে উঠলাম শাশুড়ীকে।

বয়ে গেছে আমার পান দিতে। ওই ত বলেছে আমি কাল, আমি খ্যাঁদা। আমি বিছানায়…।

হো-হো করে হেসে উঠল নরেনদা দরাজ গলায়। মুখে আঁচল

চেপে শাশুড়ী গেলেন ঘরের মধ্যে। আমি কিন্তু ধরে আছি নরেনদার হাতটা। ছেড়ে দিলে যদি পালিয়ে যায় নরেনদা।

শেষে অনেক বুঝিয়ে, পালকি আনার নাম করে ফিরে গেল নরেনদা। পরের দিন ওরা আমায় পাঠিয়ে দিল মায়ের কাছে।

জান বাবা, আমার শ্বশুরের দেড়'শ বিয়ে। মেজদার ভয়, ওরা যদি জানতে পারে বৌ পাড়াবেড়ানি তাহলে ছেলের আবার বিয়ে দিতে বাধবে না। তাই এত শাসন।

কড়া হুকুম। বাড়ির মধ্যে বন্দী হয়ে আছি। খেলাধূলা সব বন্ধ। সঙ্গী-সাথীরা আমাকে না পেয়ে খোঁজ করতে আসত। কিন্তু মায়ের ভয়ে ঢুকতে পেত না বাড়ির মধ্যে। পাছে ছুঁয়ে ফেলে, সেই ভয়ে মার কেবলি তাড়া দেওয়া।

এই সরে যা, সরে যা।

ছেলেমানুষের দল মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়াত।

কী শাস্তি আমার! দিন-রাত চোখে চোখে রাখছে। বড় রাস্তার ধারে আমাদের বাড়ি। সামনে একটা বিরাট হলঘর। আধখানা ঘরজোড়া তক্তপোশ। তার পাশে উঁচু একটা জানালা রাস্তার দিকে। ঘরে ঢুকেই বাঁ-হাতি দরজা পেরিয়ে দালান। তার এক পাশে দোতলার সিঁড়ি, আর একদিক সোজা চলে গেছে রান্নাঘরে।

আমার গণ্ডী হলঘর পর্যন্ত। সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি জানালার উপর। রাস্তায়, যাতায়াতের পথে দেখতে পাই চেনা মুখ। চোখাচোখি হলেই ডাক দেয় বাড়ির কর্তারা, 'কিরে ভবি, আমাদের বাড়ি আর যাস না কেন?'

কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে যায় আমার। বলি, 'মেজদা বারণ করেছে বাড়ি ছাড়া হতে। আমার বর এই রাস্তা দিয়ে যায়। দেখে

ফেলবে। আমি কাল, আমি খ্যাঁদা। ওরা আবার বিয়ে দেবে আমার বরের। মেজদা বলেছে আমার ঠ্যাং ভেঙে দেবে।'

কষ্ট হয় ওদের আমার কথা শুনে। বলে, 'না না, বালাই ষাট, তোর বরের আর বিয়ে দেবে না। নে, হাত বাড়া জানালা দিয়ে।'

মুঠো ভরে খাবার দেয় কেউ। কেউ হয়ত দেয় কালীবাড়ির প্রসাদ। আবার কেউ ফিরছে নিমন্ত্রণ-বাড়ি থেকে ছাঁদা বেঁধে। গামছা খুলে লুচি মিষ্টির বোঝা হাল্কা করে আমায় দিয়ে। মনের আনন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাই।

মাস দুই কাটল এইভাবে। আমার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি বাড়ছে একটু একটু করে।

দাদারা চাকুরীতে বেরিয়ে যায় প্রথমে। তারপর যায় ভাইপোরা স্কুলে। দিদি ও বৌদি মায়ের সঙ্গে খায় সকলের শেষে। তারপর সবাই উঠবে দোতলায়। দুপুরে ঘুমের বাতিক আছে মায়ের। বিকেল চারটা পর্যন্ত মায়ের ছুটি।

এই আমার মওকা। মা যখন উপরে উঠে আমি তখন মটকা মেরে পড়ে থাকি হলঘরের তক্তপোশে। উপরের আওয়াজ যখন কমলো, আমিও চুপি চুপি গা-ঢাকা দিলাম।

আজ এর বাড়ি কাল ওর বাড়ি। মনের আনন্দে মজা করছি। ঠিক হিসাব মত বাড়ি ফিরি, মায়ের নেমে আসার আগেই।

হঠাৎ সেদিন গোলমাল হয়ে গেল। মেঘলা আকাশে বেলা ঠিক পেলাম না। খেয়াল হতেই চোঁ-চোঁ দৌড়।

হলঘরে ঢুকেই চোখ পড়ল রান্নাঘরের দিকে। মা বসেছেন কুটনো নিয়ে। রাগে থমথম করছে মুখখানা। ভয়ে পাথর হয়ে গেলাম আমি। আজ আর রক্ষা নেই।

মায়ের নজর এড়াতে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই তক্তপোশের

দিকে। চোখ ফেরাতেই দেখি ঠাকুর বসে আছেন আপন মনে। এক দৌড়ে বসলাম গিয়ে কোলের উপর।

দু'হাত দিয়ে ঠাকুর আমায় জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'দিন-দিন দুষ্টু হয়ে উঠছিস।'

চটপট উত্তর দিলাম আমি।

'তুমি দুষ্টু, তুমি দুষ্টু, তুমি দুষ্টু।'

মুঠি পাকিয়ে কিল তুললেন ঠাকুর—'মেরে ফেলব তোকে।'

আমি কি ছেড়ে কথা কইব। বাঁ-হাতের খানিকটা মাংস খিমচি কেটে ধরলাম। বললাম, 'আর মারবে আমায়।'

সস্নেহে আমার মাথাটা কোলের দিকে টেনে নিলেন ঠাকুর। আমিও আদরে গলে গিয়ে বসে থাকলাম ঠাকুরের কোলে।

আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে ভবতারিণী, আমায় ত সবাই ঠাকুর বলে—তুই কি বলিস ?'

মুখ ভেঙিয়ে আমি বললাম, 'এ্যাঁ, ঠাকুর। তুমি ত আমার বরের গুরু।'

ওই কথাই শুনে আসছি বাবা সব জায়গায়। বাড়িতে মা বলে। শ্বশুরবাড়িতেও সবাই বলে—গদাই দাদা আমার বরের গুরু। আর, ঠাকুর বলতে আমার জ্ঞান—দুর্গা, কালী এই সব।

ঠাকুর আর কিছু বললেন না। চুপ করে আছেন দেখে আমি নাড়া দিচ্ছি ঠাকুরকে।

'দাদা, ও দাদা। দাদা, ও দাদা।'

ঠাকুরের মুখটা কেমন হাসি-হাসি ভাব। হাঁ করে তাকিয়ে আছি ঠাকুরের মুখের দিকে। দেখি, কেমন সোনা-সোনা আলো ফুটেছে মুখের চারপাশে। ডাকছি—

'দাদা, ও দাদা...'

একি। দাদার সারা গা থেকে কেমন যেন আলোর স্রোত বইছে! নিজের দিকে চোখ পড়তে ভয়ে আঁতকে উঠলাম। আমিও প্রায় ডুবে গেছি ওই আলোর মধ্যে।

'দাদাগো।' বলে ঢলে পড়লাম ঠাকুরের বুকের উপর।

অনেকক্ষণ পরে মনে পডল মায়ের কথা। ইচ্ছা হল মাকে দেখাই, দাদার কত রূপ।

ছুটতে ছুটতে যাচ্ছি মায়ের কাছে। দূর থেকে দেখতে পেল মা। বঁটির উপর বসে কুটনো কুটছিল। বঁটিখানা তুলে তেড়ে এল আমার দিকে। সে কী গালাগাল···

'হারামজাদী। কোথা ছিলি সারাদিন? আজ তোকে কেটেই ফেলব।'

কোন কথা আর বলা হল না। হাউহাউ করে কেঁদে উঠি। একটানা গালাগাল চলল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর সুর একটু নরম হতে মাকে বললাম।

'দেখবে এস দাদাকে, কেমন আলো বেরুচ্ছে দাদার গা দিয়ে!'

ওমা, এসে দেখি ঘর খালি। দাদা চলে গেছেন, রামদাদার বাড়ি।

এদিকে মায়ের গলার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে দিদির। সিঁড়ি ভেঙে নেমে এল দিদি ও বৌদি। মার মুখে শুনল দাদার আলো-রূপের কথা। বিশ্বাস করবে কে? ফেটে পড়ল রাগে আমার উপর। মাকে বলল,

'তোমার ছোট কন্যার কথায় তুমি বিশ্বাস কর মা? ও হাড়-হাবাতি মিথ্যাবাদী। নিজের দোষ ঢাকতে সব বানিয়ে বলেছে তোমাকে। ও কুটনি পাড়াবেড়ানি। সত্যই যদি হত, ডাকলে না কেন আমাদের।'

মা বলল, ও ত ডাকতেই এসেছিল। মিছামিছি কত গাল দিলাম মেয়েটাকে।

ঠিক সেই সময় বাড়িওলি মাসী হাজির হল আমাদের বাড়ি জল তুলতে। আমাদের বাড়ির পিছন দিকে ছিল এক মস্ত বস্তি। যতসব নষ্ট মেয়েরা ছিল ওই বাড়িওলি মাসীর তাঁবে। মায়ের কাছে সব শুনে বলল, 'হ্যাঁ মা, ওসব ত মিথ্যা নয়। তোমার বড় ছেলেকে আমি দেখেছি। তেনার উপর ভর হয় দেবতার।'

দিদি আর না করতে পারল না। কেবলই গজগজ করে রাগে আর বলে, 'নিজে দেখল, স্বার্থপর। আমাদের একবার ডাকতে পারল না! আদর দিয়ে ওর মাথাটি একেবারে খেয়েছ মা। তোমায় অনেক জ্বলতে হবে ওকে নিয়ে দেখে নিও।'

এবার বলে উঠলেন বসুমতী-মা, 'এই দেখ না বাবা, কেমন জ্বলছি এত বুড়ো-বয়সে'

···মিটিমিটি হাসছেন মা, স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

শিশুর সারল্যে ভরা মায়ের ওই মিষ্টি-মধুর হাসিটুকু দেখার জন্য বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীর শশী যেন উঁকি দিল রামাবাসের মুক্ত অঙ্গনে।

একটু থেমে আবার বলা শুরু করলেন মা :

কী সব দিন গেছে বাবা আমাদের সময়ে। কি দুঃখ কষ্ট সইতে হয়েছে মেয়েদের। এতটুকু স্বাধীনতা ছিল না বাবা। আর আজ। স্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখছে মেয়েরা ছেলেদের পাশে বসে। চাকরি করছে। ডাক্তার হয়ে রুগী দেখছে। উকিল হয়েছে, ব্যারিস্টার হয়েছে তাও শুনতে পাচ্ছি।

আমাদের কালে ন' বছরে গৌরীদান। তা না হলে সমাজ একঘরে করে রাখত। লেখাপড়ার কোন বালাই ছিল না। পান থেকে চুন খসলেই আর রক্ষা থাকত না। ধরে ধরে মার দিত মেয়েদের।

মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল বাবা বৈদিক যুগে। ছিলেন মৈত্রী, গার্গী, বাক্। ত্রেতাযুগেও ছিল স্বয়ম্বর প্রথা। নিজেরা পছন্দ করে বিয়ে করত। তারপর এল দ্বাপর, সেটা ত মেয়েদের স্বর্ণযুগ। মেয়েরা রথ চালাচ্ছে, ধনুর্বিদ্যা শিখছে, আবার ভাব ভালবাসা করে বিয়েও করছে।

এই দেখ না, কৃষ্ণসখা অর্জুন। দু'জনে আবার মামাত পিসতুত ভাই। সেই অর্জুন কিনা ভাব জমাল সুভদ্রার সঙ্গে। কৃষ্ণের প্রশ্রয় নিশ্চয়ই ছিল। দিন যায় মাস যায় ওদের অন্তরঙ্গতা বেড়েই চলে। অবশেষে কথাটা জানাজানি হতে শুরু করল।

উঠল হলধারী বলরামের কানে। রাগে অগ্নিশর্মা হলেন বলরাম। ডেকে পাঠালেন ভাই কৃষ্ণকে। দাদার প্রলয়ঙ্কর মূর্তি দেখে কৃষ্ণ হতবাক্। মনে জানেন কৃষ্ণ, দাদার এ কোপাগ্নির হাত থেকে নিস্তার নেই অর্জুনের।

শুধুমাত্র একটি আদেশ দিলেন বলরাম :

'শির চাই অর্জুনের।'

'তাই হবে। আপনি প্রসন্ন হোন।'

উত্তর দিলেন কৃষ্ণ। ছুটল যদুকুলের সামন্তের দল। আদেশ : শির চাই অর্জুনের।

এদিকে টের পেয়েছেন সুভদ্রা-অর্জুন। শরণ নিলেন তাঁরা বিপদবারণ মধুসূদনের। অভয় দিলেন শ্রীকৃষ্ণ।

সারথি সাত্যকি রথ চালাচ্ছে ভীমবেগে। গাণ্ডীব হাতে দাঁড়িয়ে আছে অর্জুন, পাশে সুভদ্রা। অগণিত যোদ্ধা ধেয়ে আসছে সমুদ্রের ঢেউএর মতো। হলধারীর নির্দেশ : শির চাই অর্জুনের।

বিপদে পড়ল সাত্যকি। যোদ্ধারা সবাই তার পরিচিত। অর্জুনের সাহায্যকারী সাত্যকি এ সংবাদ জানাজানি হলে অবধারিত মৃত্যু।

অর্জুন চাইল সাত্যকিকে মুক্তি দিতে। সাত্যকি বলে,—রথদণ্ডে আমায় বেঁধে রাখ অর্জুন। ওরা বুঝবে তোমার হাতে বন্দী আমি।

শুরু হল সাত্যকির বন্ধন। এদিকে রথ আর চলে না। সারথি কই ?

নিমেষে উঠে দাঁড়াল সুভদ্রা। অশ্বের বল্‌গা তুলে নিল নিজের হাতে। রথ ছুটল ঝড়ের বেগে।

সেই মুহূর্তে, দাদা বলরামকে নিয়ে হাজির হলেন কৃষ্ণ। বললেন, 'ঐ দেখ দাদা, সুভদ্রা নিজে চালনা করছে রথ। চলেছে অর্জুনের সঙ্গে পতিগৃহে—হস্তিনাপুরে।'

শান্ত হলেন বলরাম। দু'ভাই ফিরে গেলেন দ্বারকায়।

মন্তব্য করলেন বসুমতী-মা : দেখলে বাবা, সর্বকালে সর্বযুগে ছিল নারীর স্বাধীনতা। ছিল না কেবল কলিযুগে।

নারীর অপমান, নারীর আর্তনাদে সবংসহা ধরিত্রীও বোধ হয় কাতর হয়ে উঠেছিল। তাই ত নেমে এলেন সেই পরমব্রহ্ম-সনাতন এই ধরার ধূলিতে, নারীজাতির মুক্তি দিতে।

জান বাবা, একদিন দুপুরবেলা, দক্ষিণেশ্বরে, পঞ্চবটীর সামনে ঠাকুর বললেন গৌরদাসীকে,

'গৌর, আমি জল ঢালি আর তুই কাদা চটকা।'

গৌরমা প্রথমটা বুঝতে পারেন নি, ঠাকুর কি বলতে চাইছেন। বললেন, 'এখানে কাদা কোথায় গো ! এ-যে কাঁকুরে মাটি।'

ঠাকুর বললেন, 'তুই কি বুঝলি ; মেয়েদের দুঃখ আমি আর সইতে পারছি না। তুই তাদের লেখাপড়া শেখা। যাতে তারা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।'

সত্যযুগে সৃষ্টি হল বেদ। বেদময় ব্রহ্মারূপে প্রকাশিত হলেন

ভগবান। ত্রেতায় এলেন মনুষ্যরূপী ভগবান শ্রীরামচন্দ্র। দ্বাপরে এলেন 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'।

এল কলিকাল। ভগবান বললেন, 'কলি যাও। এবার তোমার পালা।'

কলির প্রবল আপত্তি। বলল, 'না প্রভু। আমি পারব না এত পাপ ধারণ করতে। পৃথিবীতে থাকবে না সত্যের কোনো সত্তা। লোকে হবে মিথ্যাচারী। হবে নারী নির্যাতন, নারী হত্যা। পৃথিবীর আকাশ বাতাস ভরে উঠবে পাপের পঙ্কিল নিশ্বাসে। আমায় ক্ষমা কর প্রভু।'

ভগবান আশ্বাস দিলেন কলিকে। বললেন, 'যখনি প্রয়োজন হবে, আমি যাব কলি তোমায় উদ্ধার করতে।'

যুগে যুগে তিনি এসেছেন। এবারেও এলেন। এলেন, সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ মানুষের রূপে রামকৃষ্ণ নামে।...

কে তুমি মোহনবেশে
এসেছ এ বিশ্বমাঝে।
বিভূতি বিহীন কায়
দীনবেশে এ ধরায়,
বদন সুষমান্বিত
বিকশিত পূর্ণশশী।
ভাবনেত্র নিমীলিত
করে কর বিজড়িত,
বামস্কন্ধে বিলম্বিত,
বসন অঞ্চলরাশি।

...স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করছিলেন মা। হঠাৎ থেমে গেলেন। দেখি মা ভাবস্থা। ফোঁটায় ফোঁটায় নেমে আসছে মুক্তার দানা মায়ের দু'চোখের কোল বেয়ে।

নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি আমরা দু'জনে। দেখি, মায়ের ঠোঁট দুটি ঈষৎ নড়ছে। ভাবাবেশ সংযত করে মা আবার বলা শুরু করলেন :

শুধু শুনলেই কি আর হয়! নিজেকে তৈরি করতে হবে।

লক্ষবার জপ করব, পুরশ্চরণ করব, তীর্থ ধর্ম করব—ও ত লোক দেখানো। হবে না। স্বয়ং গুরু যদি আসেন, তাতেও নয়।

মালায় নয়, করেও নয়, কেবল মনে। অভ্যাস করতে হবে মনে।

হ্যাঁ বাবা দেখেছ? বসে বসে আপন মনে কেউ ঠ্যাং নাড়াচ্ছে। বারণ কর, বন্ধ করবে। আবার একটু অন্যমনস্ক হয়েছে কি শুরু হয়ে গেল। ও কিন্তু নিজের ইচ্ছায় নাড়াচ্ছে না পা দু'টা। ওটা ওর মনের অভ্যাস। তেমনি, ধর তুমি শৌচে গেছ। অনেকক্ষণ বসে আছ পায়খানার মধ্যে আনমনা। হঠাৎ, খেয়াল হল—মনে তোমার ইষ্টচিন্তা। ছিঃ ছিঃ এই অপবিত্র স্থানে! ইষ্ট সরে গেলেন। সে আর কতক্ষণ! আবার কখন চুপিসাড়ে এসেছেন তুমি বুঝতেই পারনি। খেয়াল হল জলশৌচের সময়।

ঠিক এমনিভাবে, তোমার জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, প্রতিটি শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে জপ চলবে অবিরাম। মনে যখন অভ্যাস আসবে তোমাকে আর পায় কে।

সব সময়ে মনে রেখ বাবা—'অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়···।'

ঠাকুরের কথা বলতে আমার যে কী আনন্দ হয় বাবা। কিন্তু দেহটা দিনের পর দিন অবশ হয়ে আসছে। জানি না আর কতদিন বলতে পারব।

আমার ছিল ঘোরা বাতিক। এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে পারতাম না। এই করে সারা দেশটা ঘুরে বেড়িয়েছি ঠাকুরের নাম

নিয়ে। যখনি বেরুব, সেবাশ্রমের কোনো সাধুকে পাঠাবে মোহন্ত আমার সঙ্গে। আর যেখানে যাব তারা ত হাতে স্বর্গ পাবে।

সেবারে অনেকদিন বেরুতে পারি নি। মনটা হুহু করছে। কিছু ভাল লাগছে না। মন কেবলি টানছে বোম্বের দিকে। সেবাশ্রমের ছেলেরা আসে দু'বেলা। ওদের বলি, কেউ রাজী হয় না। বলে, 'কোথা যাবেন মা আমাদের ছেড়ে। আপনি আমাদের মা হয়ে আছেন এখানে। মন চাইলেই ছুটে আসি আপনার কাছে। কত আদর-যত্ন পাই। না মা, আপনাকে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।'

ছেলেদের কথা শুনে মনটা আরও খারাপ হয়ে যায়। চুপচাপ থাকি। কারও সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছা হয় না। একদিন বিকালে এলেন বড় মোহন্ত। মন খারাপ করে বসে আছি, দেখে বললেন,

'কি হয়েছে মা। শরীর খারাপ হয়নি ত?'

বললাম, 'না বাবা। শরীর ঠিক আছে। তবে, মনটা ভাল নেই। বড় ইচ্ছা হচ্ছে একবার বেরুতে। ব'ম্বে আর জব্বলপুর ভীষণ টানছে বাবা।'

একমুখ হেসে মোহন্ত বললেন, 'এই কথা। তার জন্য ভাবনা কেন। আমি এখনই পাঠাচ্ছি, রামানন্দ মহারাজকে। সে এবারে যাবে আপনার সঙ্গে।'

বুক থেকে যেন একখানা পাথর নেমে গেল। সন্ধ্যায় এল রামানন্দ। বলল, 'মা, ডেকেছেন আমায়।'

বললাম, 'বাবা, মোহন্ত মত দিয়েছেন। বোম্বাই হয়ে জব্বলপুর যাব আমরা। গোছগাছ শুরু কর।'

রামানন্দ ঘাড় পাততে চায় না কিছুতেই। কেবলই ওজর দেখায়। বলে, 'শরীরটা ভাল যাচ্ছে না মা। আপনার সঙ্গে

যাওয়া সে ত দু-দশ দিনের জন্য নয়। ভাল লাগলে ত আর নড়তে চাইবেন না।'

কথাটা সত্যি। রোগা শরীর রামানন্দর। অর্শ আছে, তাছাড়া মাঝে মাঝে একটা কলিক পেন-এ কষ্ট পায় ছেলেটা। ও যদি রাজী না হয় সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

আদর করে পিঠে হাত বোলাই, থুতনি ছুঁয়ে চুমু খাই। বলি, 'মায়ে ব্যাটায় যাব, নতুন নতুন জায়গা দেখব—অসুখ-বিসুখ কিছু থাকবে না বাবা।'

একটু নিমরাজী হল রামানন্দ। কিন্তু, গোঁ ছাড়ে না। বলে, 'বাইরে ত যাব, সেরকম পোষাক ত চাই। আমার গেরুয়া সব ছেঁড়াখোঁড়া।'

আমি বলি, 'সে ভাবনা আমার। এই নাও।'

তখনই বাবা, পঞ্চাশ টাকা ধরে দিলাম রামানন্দকে। আর কথা বাড়াতে দিলাম না। বললাম, 'রামানন্দ, জামা-জুতা তৈরি করাও। একটা ভাল দিন দেখিয়ে নিও মোহন্তকে দিয়ে। যত তাড়া-তাড়ি হয়।'

ফিরে গেল রামানন্দ। আমিও বাবা হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। যা একগুঁয়ে ছেলে। একটা ওজর তুললেই হল। সব যাবে ভেস্তে।

দিন স্থির হয়ে গেছে। রোজ কিছু না কিছু কিনে আনছে রামানন্দ। একটা একটা করে গুছিয়ে রাখছি নতুন কেনা ক্যাম্বিসের ব্যাগে।

যাবার দু'দিন আগে; দুপুরবেলা একখানা পোস্টকার্ড এল ভাটপাড়া থেকে। আমার কুলগুরু থাকেন ভাটপাড়ায়। গুরুদেব নেই। আছেন গুরুমা। আর তিন মেয়ে। সবাই বিধবা। ছোট মেয়েটি, গুরুমায়ের সধবা—থাকে শ্বশুরবাড়ি।

তার নাম হরিমতী। স্বামী হারিয়ে ফিরে এসেছে হরিমতী মায়ের কাছে। শেষ বয়সে এত বড় আঘাত পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন গুরুমা। স্বামীহারা মেয়েটিকে নিয়ে একটু শান্তির আশায়, কয়েকদিনের জন্য আশ্রয় চান আমার কাছে।

চিঠিখানা পড়ে ব্যথায় ভরে উঠল সারা মন। গোছগাছ সব পড়ে রইল। চুপচাপ বসে থাকলাম।

বহুক্ষণ কেটে গেল ওইভাবে। মনে হল, কে যেন উঠে আসছে দোতলায়।

দু'হাতে দুটা ব্যাগ ঝুলিয়ে এল রামানন্দ। রোদে ঘেমে টকটক করছে মুখখানা। চাদরের খুঁট দিয়ে মুছল মুখখানা। তারপর উবু হয়ে বসে এক একটা প্যাকেট বার করতে লাগল ব্যাগ থেকে। একটা ব্যাগ খালি করে বলল, 'মা কেনাকাটা আজ শেষ। এই দেখুন আমার জামাকাপড়।'

এই বলে বার করল আর একটা ব্যাগ থেকে তার গেরুয়া পোষাক।

ও একাই বকছে। আমার কোনো সাড়া নেই। বোধহয় বুঝল। মুখ তুলে দেখে আমার নজর নিচের বাগানে।

ঘাবড়ে গেল রামানন্দ। একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে বলল, 'কি হল মা আপনার? এমন চুপচাপ বসে কেন?'

কোনো কথা না বলে চিঠিখানা তুলে দিলাম রামানন্দের হাতে।

এক নিশ্বাসে চিঠিটা শেষ করে উত্তেজিত কণ্ঠে রামানন্দ বলল, 'তা কি করে হবে! আপনি ওদের লিখে দিন মা, এখন আসা হবে না। চারিদিকে চিঠি-পত্র চলে গেছে। যাবার দিন ঠিক। ওরা বরং কিছুদিন পরে আসুক। আমরা ফিরে আসি, তারপর।'

সায় দিতে পারলাম না রামানন্দের কথায়। বললাম, 'সে কি

হয় বাবা। এতবড় শোক-তাপ পেয়েছেন। কত আশা নিয়ে লিখেছেন একটু আশ্রয়ের জন্য। ওদের কি ফেরাতে পারি। ওরা যে আমাদের 'গুরুবংশ। এইটুকু সাহায্যে যদি না আসতে পারি তাহলে আমার যে মহাপাতক হবে বাবা।'

বড় অসহায় মনে হল রামানন্দকে। হতাশ কণ্ঠে বলে উঠল, 'তাহলে উপায়! সব বন্ধ করে দিই?'

আমি বললাম, 'তা কেন, আমরা ত যাবই, ওরাও যাবে আমাদের সঙ্গে। তুমি বরং একটা তার করে দাও ওদের। কাল দুপুরের গাড়িতে যেন ওরা রওনা হয়।'

রামানন্দ একে রগচটা, তার উপর আমার মতলব শুনে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। বলল, 'আমার দ্বারা হবে না মা। একে আপনাকে সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাই, তার উপর ওঁরা গুরুবংশ! কখন কোথায় উঠব ঠাকুর জানেন। খাওয়া সব সময় জুটবে কি না কে বলতে পারে। হয়ত ফল-দুধ খেয়ে কাটিয়ে দেব কোনোদিন। ওঁরা এলে, যাও রামানন্দ বাজার করে আন। ভালমন্দ খাওয়াতে হবে। ওঁরা খাবেন, বাসন মাজতে হবে আপনাকে। ওঁরা শোবেন, বিছানা পাততে হবে। কিছু বললেই বলবেন—ওঁরা যে গুরুবংশ। এত তাল আমি সামলাতে পারব না মা। তাছাড়া, টাকা! আরও ত টাকা চাই।'

রামানন্দ বিগড়ে গেলে সব পণ্ড! আমি বাবা, উঠে এসে ধরলাম ওর হাত দু'টি। আবদার করে বললাম, 'সব ঠিক হয়ে যাবে বাবা। ঠাকুর যখন টেনেছেন, যাওয়া নিশ্চয়ই হবে। মাথাটা ঠাণ্ডা কর রামানন্দ। বরং আরও একটা তার কর আমার ছেলেকে। পাঁচ-শ টাকা পাঠাতে বল টেলিগ্রাফ মনি-অর্ডারে।'

ওঁরা এলেন। টাকাও এল। সকলকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। ঠিক হল, এই সুযোগে জয়পুরটা ঘুরে যাব।

হয় আশ্রম, না হয় ধরমশালা। জয়পুরে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম নেই। রামানন্দ নিয়ে তুলল আমাদের ধরমশালায়।

মানসিংহের প্রাসাদ, যশোরেশ্বরীর মন্দির, যন্তর-মন্তর এইসব ঘুরে ঘুরে দেখি ওদের নিয়ে। এটা ওটা দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করি মা ও মেয়েকে। ঘুরতে ঘুরতে দেখে আর নজরধরা জিনিস দেখলেই কিনতে থাকে।

জান বাবা, শ্বেতপাথরের বাসন জয়পুরে খুব পাওয়া যায়। পাথরের থালা বাটি গেলাস যা দেখছে সবই কিনছে। আর, গায়ের রাগ গায়ে মারছে রামানন্দ। আড়ালে, আমাকে পেয়ে একদিন রাগে ফেটে পড়ল রামামন্দ। বলল, 'একা বেটাছেলে। এইসব পাথরের বোঝা সামলাই কি করে। এভাবে রাশ আলগা দিলে বোম্বাই পর্যন্ত পেঁাছানো যাবে না।...পরশু দিন এক সের গাওয়া ঘি আনলাম, সব সাফ্! এত যোগাড়ই বা কোথা থেকে করি!'

দুষ্ট সরস্বতী ভর করেছে রামানন্দের কণ্ঠে। পাছে গুরুমা শুনতে পান—থামিয়ে দিই রামানন্দকে। বলি, 'চুপ্-চুপ রামানন্দ। ও কথা বলতে নেই বাবা। পাড়াগাঁয়ে মানুষ, অত হিসাব করে কি চলতে পারে? ওরা জানে বড়লোক শিষ্য, ভার বইতে পারবে, তাই ত এসেছে আমার সঙ্গে।'

রাগে গরগর করে রামানন্দ। আর ও বেচারার দোষ দিই বা কি করে। রান্না করে হরিমতী। ভাতে ঘি, ডালে ঘি, তরকারিতে ঘি। একসের ফুরাতে কতক্ষণ?

না বাবা, বেশী দিন থাকা হল না জয়পুরে। রওনা দিলাম বোম্বাই। মিশনের আশ্রম ছিল, তখন খারেতে। এখানকার মতো জমজমাট ছিল না।

বিরাট চৌহদ্দি। চারিদিকে ছড়ানো-ছিটানো সাধুদের ঘর।

একদিকে রান্নাবাড়ি। আর মেন গেটের কাছে ছিল পাকা বাড়ি একখানা—দোতলা। নিচের তলায় দু'খানা ঘর। পাশে সিঁড়ি ছাদে ওঠার। উপরে ঘর একখানি। ঠাকুর থাকেন। লম্বা টানা বারান্দা ঘরের সামনে। ঠাকুরঘরের মাঝে একটি বড় দরজা আর দু'টি ছোট দরজা দু'দিকে।

মেয়েদের থাকার কোনো গেস্টহাউস নেই। আশ্রম থেকে কিছু দূরে, একটা বাড়ি যোগাড় করে রেখেছেন মোহন্ত আমাদের জন্য। আমরা উঠলাম সেইখানে।

রামানন্দ থাকে আশ্রমে। খায় দু'বেলা আমাদের কাছে। আশ্রমের ছেলেরা খুব খুশী রামানন্দকে পেয়ে। সুন্দর গানের গলা রামানন্দর। যেমন ঠাকুরের গান গায় তেমনি শ্যামাসংগীত। রামানন্দকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল—বিশেষ করে গৃহী ভক্তদের। আজ এখানে ত'ল সেখানে গানে মেতে উঠল রামানন্দ। আমিও বাবা খুব খুশী। দু'বেলা বসি ঠাকুরের কাছে। আর সকাল-সন্ধ্যা ক্লাস ত আছেই।

...ক্লাসের কথা শুনে আমি আর আমার স্বামী—দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি।

মা বুঝতে পেরে আবার বলতে শুরু করলেন :

যখনি যেখানে যাব, তোমাদের মতো ছেলেমেয়েরা ছেঁকে ধরবে ঠাকুরের কথা শুনতে। আমি বাবা ঠাকুরের কথা বলতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তাই, যখনই যেখানে যাই ওরাই ব্যবস্থা করে ক্লাসের। বলে, 'মা, ঠাকুরের নাম যত প্রচার হয়...।'

একসঙ্গে যাতে ভিড় বেশী না হয়, তাই, সময় বেঁধে দিয়েছে। সকাল আটটা থেকে দশটা, দুপুরে—দু'টা থেকে চারটা। আবার চারটা থেকে ছ'টা। সন্ধ্যায় ঠাকুরের আরতি। সেই সময়টা বাদ

দিয়ে রাত আটটা থেকে দশটা। দিন-রাত কোথা দিয়ে কেটে যায় জানতেই পারিনি।

খুব ভোরে স্নান সেরে হরিমতী যায় মন্দিরে। ফিরে এসে রান্নায় বসে। একটু বেলায় গুরুমাকে নিয়ে আমি যাই আশ্রমে। ঠাকুর প্রণাম সেরে আমি বসি ক্লাসে আর ধ্যান জপ সেরে গুরুমা ফেরেন অনেকটা বেলায়।

ক'দিন ধরেই গুরুমা বলছেন, 'হ্যাঁ মা ভবতারিণী, তোদের রামকৃষ্ণ ত কালীপূজা করতেন। মা-কালীর ছবি এরা ঠাকুরঘরে কেন রাখেনি মা। বল না মা, তোর ছেলেদের, কালীর ছবি একটা এনে দিতে।'

জান বাবা, আমার গুরুবংশ হল ঘোর শাক্ত। তাই গুরুমা কেবলি বলছেন মা-কালীর ছবির কথা। আর আমাদের ঠাকুর, ওদের কাছে রামকৃষ্ণ—কালীর পূজারী।

আরও আছে বাবা, বড়লোক শিষ্য যজমান আজকাল কেউ আর যায় না ওদের কাছে মন্ত্র নিতে। সবাই যায় বেলুড়ে। রাগ হবারই ত কথা।

মুখে কিছুই বলি না। রোজই শুনি, 'ও মা ভবতারিণী, বল না মা তোর ছেলেদের। মা-কালীর ছবি একটা এনে দিক। আহা, এমন সুন্দর ঠাকুরঘরে মা-কালীর ছবি একখানা থাকবে না?'

কথাটা আমারও লাগছে। মোহন্তকে বললাম, 'বাবা কালীর ছবি একটা আনতে হবে। আমার গুরুমার বড় ইচ্ছা, ঠাকুরঘরে কালীর একখানা ছবি থাকুক।'

না করতে পারল না মোহন্ত। লোক পাঠাল বাজারে। হায় কপাল! এমন দেশ বাবা, কোথাও পেল না ছবি। মোহন্ত হাসে

আর বলে, 'ও মা, কি বিপদেই পড়লাম। ছবি ত নেই-ই, উপরন্তু বলে কি জানেন? তোমাদের কালী কি ঠাকুর—বেটাছেলে না মেয়েছেলে?'

শুনে হাসব না কাঁদব ভেবে পাই না। গুরুমাকে বলি, 'দুঃখ ক'র না মা। এমন পোড়াকপালে দেশ, কালীর ছবি পাওয়া গেল না। কাশীতে ফিরি, নিজে কার্পেটে বুনব মায়ের ছবি। পাঠিয়ে দেব মা নিশ্চয়ই।'

মন মানে না গুরুমায়ের। কেবলই দুঃখ করেন আর বলেন ওই একই কথা।

দেখতে দেখতে কেটে গেল প্রায় পাঁচ মাস। দেশে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল মা মেয়ে দু'জনেই। আমার বাপু মন সায় দিচ্ছে না। একদিন দুপুরে রামানন্দ তুলল, 'মা, আর কেন, এবার চলুন কাশী যাই।'

আমি বলি, 'সে কী বাবা, কাশী কেন? আমরা ত এবার জব্বলপুর যাব।'

মুচকি হেসে রামানন্দ বলল, 'রেস্ত সব শেষ। তলানি যা ঠেকেছে তাতে কাশী ফেরার রাহা-খরচটুকু হয়ত হবে।'

আমি বলি, 'কলকাতায় চিঠি লেখ। খোকাকে বল টাকা পাঠাতে।'

রামানন্দ কিছুতেই রাজী নয়। বলে, 'না মা, তা হয় না। আপনার ছেলে কি ভাববে বলুন ত? সাধু হয়ে শেষে চোর বদনাম নেব। এই সেদিন পাঠালেন পাঁচ-শ। আবার!'

আমি বলি, 'তুমি অত ভাবছ কেন বাবা। টাকার ভাবনা আমার উপর ছেড়ে দাও। তুমি না পার, আমি লিখব।'

বড় একরোখা রামানন্দ। জিদ ধরলে বোঝানো শক্ত। টাকার

কথায় সুবিধা হল না দেখে অন্য সুর ধরল। বলল, 'শরীরটা ঠিক যাচ্ছে না মা। মাঝে মাঝে কলিক-পেনটা মাথা তুলছে।'

বুঝলাম, ওদের আর আটকানো যাবে না। তাই, সেদিন সন্ধ্যা-বেলা ঠাকুরের আরতির পর মোহন্তকে বললাম, 'বাবা, এবার আমাদের অনুমতি দাও। গুরুমা, হরিমতী ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। রামানন্দের শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না।'

শুনে অবাক হয়ে গেল মোহন্ত। বলল, 'এই ত মাত্র এলেন সেদিন। এখনি যাওয়া! আমরা কি আপনার ছেলে নই মা। দূর দূর দেশ থেকে কত ভক্ত আসছে ঠাকুরের। আপনার মুখে শুনছে ঠাকুরের কথা। কত প্রচার হচ্ছে ঠাকুরের নাম। এখুনি কি ছাড়া যায় মা আপনাকে।'

কি বিপদেই পড়লাম বাবা। যত বলি গুরুমার কথা—হরিমতীর কথা, মোহন্ত শুনতেই চায় না। রামানন্দের কথা তুলতেই পেয়ে বসল মোহন্ত। বলল, 'আর এক মাস পরে স্বামীজীর জন্মতিথি। রামানন্দ যাবে কি করে? সারাদিন উৎসব চলবে। ভক্তদের সবাইকে বসিয়ে ভোগ খাওয়ানো হবে। সন্ধ্যায় বসবে গানের আসর।'

সত্যই ত। রামানন্দ আমার গান-বাজনায় যেমন ওস্তাদ, তেমনি রান্নাবান্না লোক খাওয়ানো পরিবেশন করা সব ব্যাপারেই চৌকশ। কোমরে চাদর জড়িয়ে হাজার লোকের দায়-দায়িত্ব একাই সামলায়। মোহন্তর কথায় সায় দিয়ে বাসায় ফিরলাম।

রাত্রে এল রামানন্দ। বললাম, 'ও বাবা রামানন্দ, মোহন্ত যে যাওয়া আটকে দিল। বলল, স্বামীজীর উৎসব। রামানন্দ না থাকলে কি চলে। কত লোকজন আসবে, গান-বাজনা হবে।'

ও হরি, আমি বললাম সরল মনে—ফল হল উল্টা। রাগে বিশ্বামিত্র হয়ে উঠল রামানন্দ। থালা ফেলে ওঠে আর কি। বলে,

'আপনি কেন বলতে গেলেন মা। দিলেন ত সব পণ্ড করে। তালমাফিক কথাটা আমি পাড়তাম মোহন্তর কাছে।'

কি আর করি বাবা। চুপ করে থাকলাম। থাকার মেয়াদ বেড়ে গেল আরও এক মাস।

স্বামীজীর উৎসব মিটল। দু-একদিন পরে একদিন সন্ধ্যায় রামানন্দ বলল, 'মা, কাল সকাল সকাল রান্না সেরে রাখবেন। আমরা বেরুব বেলা বারটায়। কাল আর আমি এখানে খাব না। আশ্রম থেকে ফেরার পথে টাঙ্গা আনব দু'খানা। তৈরি হয়ে থাকবেন আপনারা।'

শুনে হরিমতী খুব খুশী। খুশী গুরুমাও। রামানন্দ যাবার পরেই ওরা মায়ে-ঝিয়ে বসে গেল বাঁধা-ছাঁদা করতে।

ভোরবেলা স্নান সেরে হরিমতী গেল আশ্রমে। ফিরে এসে ঢুকল রান্নাঘরে। গুরুমা'কে নিয়ে আমি বেরুচ্ছি, ডাক দিল হরিমতী।

'সকাল-সকাল ফিরবে দিদি। হাড়ি-হেঁশেল নিয়ে আটকে রেখো না আমায়।'

আজ আর ক্লাস নেই। ঘুরে ঘুরে কথা বলছি ছেলেদের সঙ্গে। গুরুমা উঠেছেন দোতলায়, ঠাকুরঘরে।

মন খারাপ ছেলেদের। সকলের ইচ্ছা, আরও কিছুদিন থাকি। আমার অসুবিধা ওরা কিছুতেই মানতে চায় না। বলে, 'ওরা ফিরে যাক মা কলকাতায়। আপনি থাকুন আরও কিছুদিন।'

বেলা বাড়ছে। গুরুমা এখনও নামেন নি। পায়ে পায়ে হাজির হলাম মন্দিরে। গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করলাম ঠাকুরকে। ঠাকুরের মুখোমুখি বসে আছেন গুরুমা। হাত দুটি জড় করা বুকের উপর। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে।

ভাবলাম, শোক তাপ অনেক পেয়েছেন মা ঠাকরুণ। হয়ত আর্তি জানাচ্ছেন ঠাকুরের কাছে। ডাকতে আর ইচ্ছা হল না।

ঠাকুরের সেবক গঙ্গাধর। দাঁড়িয়ে ছিল বাইরের বারান্দায়। মুখটি শুকনা। এলাম তার কাছে।

গঙ্গাধরেরও একই অনুরোধ। বলল, 'আরও কিছুদিন থেকে যান মা।'

কি করে বোঝাই আমার পাগল ছেলেদের।...ওরে যেতে কি আমারই মন চাইছে। কিন্তু রামানন্দ না নিয়ে কি যাবে ?

খাবার ঘণ্টা পড়ল। ঠাকুরকে শয়ন দিয়ে মন্দির বন্ধ করবে গঙ্গাধর। কিন্তু গুরুমা আছেন ভিতরে। গঙ্গাধরকে বললাম, 'তুমি দরজা বন্ধ করতে শুরু কর। গুরুমাকে নিয়ে আমি এখনই ফিরছি।'

এলাম গুরুমার পাশে। দেখি, এখনও সেই অবস্থা। ভাবের ঘোরে কখনও হাসছেন কখনও কাঁদছেন। ডাকি, 'গুরুমা, ও গুরুমা।'

সাড়া নেই। তখন, নীচু হয়ে গুরুমার কোমর জড়িয়ে তুলে দাঁড় করাই। চলার ক্ষমতা নেই গুরুমায়ের। পা ঘষে ঘষে নিয়ে আসি বারান্দায়।

ইতিমধ্যে ঠাকুরকে শয়ন করিয়ে ঘর বন্ধ করল গঙ্গাধর। দেয়ালের হুকে চাবি ঝুলিয়ে গঙ্গাধর গেল রান্নাবাড়ি। সাধুরা সব বসে আছে তার অপেক্ষায়।

গুরুমাকে নিয়ে এক-পা এক-পা করে নামছি। সিঁড়ির মাঝামাঝি যখন এলাম, চমক ভাঙল গুরুমায়ের। দু'হাতে আমায় জড়িয়ে গুরুমা বললেন :

'ভবতারিণী দেখেছিস মা, এরা মা-কালীকে কেমন সাজিয়েছে ? মায়ের কি রূপ রে! জবার মালা দুলছে গলা থেকে পা পর্যন্ত।

মায়ের উপর হাতে নিচের হাতে ফুলের গয়না। পায়ের তলায় মায়ের রাশি রাশি জবা ফুল। দেখেছিস মা···মায়ের নাচ দেখেছিস? চারহাতে তালি দিয়ে মায়ের কি নাচ রে। দুলে দুলে নাচছে মা আমার। জবার মালা দুলছে এদিক থেকে ওদিকে। মায়ের চোখ ঘুরছে উপর-নিচে। আর সে কি অট্টহাসি গো মা! হ্যাঁমা ভবতারিণী, এত জবা এরা কোথায় পেল মা?'

চোখ দুটি বুজিয়ে মার রূপ চিন্তা করছি। সর্বাঙ্গে শিহরণ লাগছে বিদ্যুতের মতো। গুরুমা দাঁড়িয়ে আর আমিও। একটি হাত আমার চিবুকে ঠেকিয়ে আবদার ধরলেন গুরুমা, 'একবার চ'না মা মন্দিরে। আর একটিবার দেখে আসি আমার মায়ের নাচ।'

আমার পা-দুটো কেবলি উঠতে চায় দোতলায়। নিচে নামা আর হল না। গুরুমাকে নিয়ে আবার দোতলায়। ঠাকুরঘর বন্ধ।

ছেলেরা খেতে বসেছে দরজা খুললেই ছুটে আসবে হাঁ হাঁ করে। থমকে গেলাম। গুরুমাকে বললাম, 'এখন থাক মা। চলুন বাসায় যাই। বিকাল চারটায় মন্দির খুলবে, তখন আসব। চক্ষু সার্থক করব মায়ের নাচ দেখে।'

গুরুমা খুব খুশী। মা-কালীর নাচ আবার দেখতে পাবেন। আনন্দে টস্‌টস্ করছে গুরুমায়ের মুখখানা। আর আমি! বঞ্চিতের ব্যথায় প্রাণটা আমার ছট্‌পট্ করছে তীর বেঁধা পাখির মতো।

দু'জনে ফিরে এলাম বাসায়। দেরি দেখে ঘরবার করছে হরিমতী। তখনও ঘরে ঢুকিনি, চেঁচিয়ে উঠল হরিমতী—'কি বে-আক্কেলে মানুষ তোমরা, আজও এত দেরি করতে হয়। রামানন্দ ত এল বলে। সে মানুষটা বলবেই বা কী। গালমন্দ খাওয়া বরাত তোমার। কিছুতেই চৈতন্য হয় না।'

আরও কত কি বলে গেল সে। আমার তখন যা মনের অবস্থা;

কানে কিছুই ঢুকল না। হরিমতীকে বললাম, 'তোমরা খেয়ে নাও, ভাই। আজ আর আমি কিছু খাব না।'

গর্জে উঠল হরিমতী—'তার মানে?'

শান্তকণ্ঠে হরিমতীকে বললাম, 'আজ আমরা যাচ্ছি না।'

ওকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ঘরে ঢুকলাম। এক কোণে জড় করা ছিল শোবার কম্বল। সেইটা পেতে পাশ ফিরে শুয়ে থাকলাম। বাইরে তখন প্রবল গর্জন চলছে হরিমতীর।

'তা যাবে কেন। বড় মজায় আছ এখানে। ব্যায়রামে কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা—তোমার প্রাণ কাঁদবে কেন। নিজের ছেলে ত নয়। পেটে ধরনি, বুঝবে কেমন করে···।'

ঠিক সময়ে রামানন্দ এল। হাতে ছাতা, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। ওর জামাকাপড় সব ওই ব্যাগের মধ্যে। দু-খানা টাঙ্গা নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে।

ঘরে ঢুকেই দেখে আমি শুয়ে আছি। দালানে তিনজনের ভাত বাড়া।

শুয়ে আছি দেখে ঘাবড়ে গেল রামানন্দ। ভাবল, বুঝি শরীর খারাপ। কাছে এসে ডাকল, 'মা, কি হল? আপনি এখনও খান নি? টাঙ্গা যে দাঁড়িয়ে··· ।'

কি করে সামলাই ছেলেটাকে। একমনে ঠাকুরকে ডাকছি। উঠে বসলাম। গুরুমার দর্শনের সব কথা বললাম রামানন্দকে। যে ঠাকুরকে উনি কখনও স্বীকার করেননি সেই রামকৃষ্ণদেব কালী হয়ে কী সাজে সেজেছেন, কী নাচ নেচেছেন সব বললাম।

'বাবা, আজকের দিনটা যাওয়া পিছিয়ে দাও। বিকালে, একবার, ঠাকুরকে না দেখে আমি যাব না। তুমি বরং জেনে নাও, রাত্রে গাড়ি আছে কি না।'

শান্ত হয়ে রামানন্দ সব শুনল। বলল, 'ওদের যে ডেকে আনলাম।'

আমি বললাম, 'তাতে কি হয়েছে। একটা করে টাকা দিয়ে দাও তু'জনকে। হাসিমুখে ফিরে যাবে।'

রামানন্দ বলল, 'টাকা কেন মা, একটা করে সিকি দিলেই হবে।'

এরপর রামানন্দ বার করল ওর টাকার পুঁটলি। তুটা সিকি যখন বার করল বাবা, আমার আনন্দ দেখে কে! তাহলে আজ থাকতে পাব। দেখতে পাব আমার ঠাকুরের গয়নাপরা জবার সাজ! নূপুরপরা মোহন নাচ!!

একি হল! টাকার পুঁটলি আবার কেন খুলছে রামানন্দ··· একটা সিকি তুলে রাখল পুঁটলিতে।

বোবা হয়ে বসে আছি। সান্ত্বনার ছলে রামানন্দ বলল, 'মা, আমার তু'টা চোখ। আপনার তু'টা আর গুরুমার তু'টা। বিকেলে আমরা যখন মন্দিরে যাব, গুরুমা তাঁর তু'চোখে দেখবেন মায়ের নাচ। আমি আর আপনি চার চোখে দেখব ঠাকুর বসে আছেন পদ্মাসনে। সে হবে না, মা, বেরিয়েছি যখন, আজ নিশ্চয় যাব।'

এই না বলে, রামানন্দ হাতের সিকিটা নামিয়ে রাখল থালার সামনে। হরিমতীকে বলল, 'দিদি খেতে হয় খাও না হয় বেরিয়ে পড়। বাঈ আসবে ঘর ধুতে সিকিটা তার জন্য রইল।'

তারপর! রামানন্দ তু'হাতে তুটা ব্যাগ নিয়ে যেই না পিছন ফিরেছে আর আমিও ঝাঁপিয়ে পড়লাম একটা ব্যাগের উপর। আর্তস্বরে বলে উঠলাম, 'কিছুতেই যাওয়া হবে না আজ। রামানন্দ, কথা শোন। কথা শোন রামানন্দ।'

আমি কি আর পারি বাবা রামানন্দের সঙ্গে গায়ের জোরে। হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিল ব্যাগটা। এক নিমেষে রামানন্দ উধাও।

আছাড় খেয়ে পড়লাম, কম্বলের উপর। কেবল ফুলে ফুলে কাঁদি। টাঙ্গায় বসে আছে রামানন্দ। টাঙ্গাওয়ালা দু'জনে মাল-পত্তর তুলতে লাগল। হরিমতী বেরিয়ে গেল গায়ে চাদর জড়িয়ে। আমাকে একলা রেখে গুরুমা যেতে পারছেন না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দেরি হচ্ছে দেখে ফিরে এল রামানন্দ। মাথায় তার দুষ্টবুদ্ধি। বলল, 'মা, তাহলে জব্বলপুরে টিকেট কাটা হবে ত ?'

দেখলে বাবা, আগাগোড়া বলছে কাশী যাব। এখন আমাকে ঠাণ্ডা করার জন্য বলল জব্বলপুর। আমিও বাবা ফেটে পড়লাম রাগে। চীৎকার করে বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ জব্বলপুরেই যাব।'

হাসতে হাসতে ফিরে গেল রামানন্দ।

চারজনে যখন আমরা বেরুই, আমি আর রামানন্দ বসি এক টাঙ্গায়। আর, গুরুমা হরিমতীকে নিয়ে উঠেন আর একটায়। এদিন আমার আর ইচ্ছা হল না রামানন্দের মুখ দেখি। রাগে তখনও ফুলছি আমি। টাঙ্গায় দেখলাম রামানন্দ একা। আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ওর পাশে আমি কিছুতেই বসব না।'

কি আর করেন গুরুমা, নেমে এলেন ও টাঙ্গা থেকে। বসলেন রামানন্দের পাশে। হরিমতীকে নিয়ে আমি বসলাম।

বড় ব্যস্তবাগীশ রামানন্দ। গাড়ি যদি ছাড়ে চারটায় রামানন্দ স্টেশনে আসবে দুপুর বারটায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকবে। কিছু বললেই বলবে, কি দরকার তাড়াহুড়ো করার।

স্টেশনে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। দেখলাম, রামানন্দ চিঠি লিখছে জোড়া পোস্টকার্ডে। পরে ও আমাকে বলেছিল—চিঠি লিখল মোহন্তকে, থারে।...আজ বিকেলে ঠাকুরঘর খোলার পর যদি কিছু দেখেন বা পান, পত্রপাঠ জব্বলপুরের ঠিকানায় জানাতে ভুলবেন না।

স্টেশনেই ছিল ডাক-বাক্স। তখনি পোস্ট করল চিঠিখানা।

ছোট লাইনের গাড়ি। চারটা কি পাঁচটা কোচ মনে পড়ছে না বাবা। মাঝে একটা স্টেশনে বড় গাড়িতে উঠলাম। জব্বলপুরে যখন এলাম বেশ রাত। টাঙ্গায় এলাম ধরমশালায়।

বিরাট বাড়ি। ঘেরা কম্পাউণ্ডে যাত্রী বোঝাই। গেটের সামনে বসে ছিল একদল বোধ হয় চাকর-বাকর। রামানন্দকে দেখে হৈ হৈ করে উঠল। সাধুবাবা আয়া, সাধুবাবা আয়া।

ছেঁকে ধরল আমাদের। টাঙ্গা থেকে মাল নামাল ওরা। হলঘরের মধ্যে শোয়ার জায়গা ওরাই করে দিল।

সারাদিন কারুর পেটে দানা পড়ে নি। এত রাত্রে, খাবার কিছু পাওয়া যাবে কিনা—রামানন্দের মহা ভাবনা। ডাকল ওদের একজনকে। বলল, 'হ্যাঁরে, দুধ পাওয়া যাবে ?'

'জী মহারাজ।'

উধাও হল লোকটা। আমি ভাবলাম, ও বুঝি গেল দুধ আনতে। ওমা! ফিরল তখনি। একটা পিতলের লোটা আর লণ্ঠন নিয়ে। দু'টা টাকা দিল রামানন্দ। বলল, 'এক টাকার দুধ তুই খাবি। আর এক টাকার দুধ আনবি আমাদের জন্য।'

নগদ টাকা পেয়ে লোকটা খুব খুশী। ছুটল দুধের খোঁজে।

স্কুলবাড়ির হলঘর দেখেছ বাবা ? কাঠের পার্টিশান দিয়ে ভাগ করা। ঠিক সেই রকম একটা লম্বা হলঘরে জায়গা পেলাম আমরা। ভিতরে পার্টিশান নেই বটে তবে দরজা অনেকগুলো। এক একটা দরজা বরাবর যাত্রীরা বিছানা পেতেছে। রামানন্দ জায়গা পেল একেবারে শেষের দিকে দেয়াল ঘেঁষে। মধ্যে তিনদল যাত্রী। তারপর একটা ফাঁকা জায়গায় হরিমতী বিছানা পাতল। ওদের মাঝে আরও দু-দল। হলের মাঝামাঝি হ'ল আমার জায়গা।

খুব তাড়াতাড়ি ফিরল লোকটা দুধ নিয়ে। চারভাগ করল গুরুমা। তার ভাগটুকু খেয়ে রামানন্দ গেল শুতে। হরিমতী খেল। নিজেরটুকু খেয়ে গুরুমা বললেন, 'মা ভবতারিণী, মাটির ভাঁড়ে তোর রইল মা। দুধটুকু খেয়ে ভাঁড়টা দোরগোড়ায় রাখিস। ভোরবেলা আমার কাজে লাগবে।'

সেই যে দুপুর থেকে কথা বন্ধ করেছি, একবারও মুখ খুলিনি। ভিতরটা যেন দাউদাউ করে জ্বলছে।···মাকে আমার দেখতে দিল না ছেলেটা।

দুধের ভাঁড়টা সরিয়ে রেখে কম্বল পাতলুম। আলো নেই ধরমশালায়। উঠানের মাঝে ঝুলিয়ে রেখেছে বিরাট এক কেরোসিনের কুপি। দু' মুখে দুটো নলের মধ্যে পলতে জ্বলছে। হলের মধ্যে দুটো একটা দরজা তখনও খোলা। সেই ফাঁকে যতটুকু আলো ভিতরে আসতে পারে।

ব্যাগ থেকে বার করলাম ঘটিটা। সারাদিন শৌচে যাই নি। বেরিয়ে দেখি, সারা উঠান ভরে আছে যাত্রীর দলে। কেউ বা দল বেঁধে শুয়ে আছে। আবার কোনো দল আগুন জ্বেলে লিট্টি পোড়াচ্ছে।

কুয়াতলায় গেলাম। দড়িবাঁধা বালতি ঝুলছে। বরফগলা জল। হাতে মুখে ঢেলে যেন প্রাণ পাই বাবা।

এলাম ধরমশালার বারান্দায়। চাপ চাপ অন্ধকার জমাট হয়ে আছে।

আমি যেন হারিয়ে গেলাম বাবা ওই অন্ধকারের রাজ্যে। হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে যাচ্ছি নিজের বিছানার দিকে। একি! সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে কেন? ভুল করে আমি এ কোথায় এলাম! এ যে মায়ের মন্দির—মা-কালী দাঁড়িয়ে আছেন

সিংহাসনে। মায়ের গলায় দুলছে জবা ফুলের মালা। মায়ের হাতে পায়ে কত ফুলের গয়না। মায়ের পাদপদ্মে স্তূপীকৃত জবার রাশি। এ আমি কোথায় এলাম গো ?

'রামানন্দ, রামানন্দ···তুমি কোথায় বাবা। একবার এস এখানে। অন্ধকারে আমি কোথায় চলে এসেছি। একবার এস বাবা এখানে।'

রামানন্দের কোনো সাড়া নেই। বার বার আমি ডাকছি। অঘোরে ঘুমুচ্ছে ছেলেটা।

দুটি পৃথক সত্তা তখন আমার মধ্যে কাজ করছে। একজন সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে মায়ের ভুবন ভোলানো মূর্তির দিকে। আর একজন, ডাকছে—আমি কি ভুল করে কোনো মন্দিরে এলাম !

আবার ডাকলাম, 'রামানন্দ, একবার এস বাবা···। দেখ, আমি বোধহয় এদের কালীমন্দিরে এসে গেছি।'

এবার শুনতে পেল। কাঁচা ঘুম ভেঙেছে, তিরিক্ষি মেজাজে বলে উঠল রামানন্দ, 'আচ্ছা পাগলের পালায় পড়েছি। সেই সকাল থেকে কালী-ডাক শুরু করেছেন—থামবার নামটি নেই। শুয়ে পড়ুন মা, রাত এখনও অনেক বাকী।'

রামানন্দ বিছানা ছাড়ল না। আবার ডাকলাম, 'রামানন্দ, ও বাবা রামানন্দ···।'

রামানন্দ রাগে অগ্নিশর্মা। তেড়ে উঠল আমায়, 'কি ঝকমারি করে এসেছিলাম আপনার সঙ্গে। এইজন্য লোকে বলে, "পথি নারী বিবর্জিতা"।'

আমারও বাবা রাগ চড়ে গেল। বললাম, 'আমারও হাজার ঝকমারি তাই তোমার সঙ্গে এসেছি। কখন থেকে ডাকছি, আমায় নিয়ে চল রামানন্দ। আমি এদের মা-কালীর সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমার বিছানাটা দেখিয়ে দাও। কিছুতেই এলে না ?'

মা-কালীর সামনে দাঁড়িয়ে আমি, কথাটা যেই না শোনা—লাফিয়ে উঠল রামানন্দ। সামনের দরজাটা একটানে খুলে ছুটে এল আমার বিছানার কাছে।

কাছাকাছি যখন এল রামানন্দ মিলিয়ে গেছেন মা। আর *ঠিক সেইস্থানে বসে আছেন ঠাকুর। সেই একই রূপে, যেমন আমরা দেখি পটের মধ্যে—পদ্মাসনে।*

মা-কালীর দর্শন পেল না রামানন্দ, তবে, দূরে দেখল ঠাকুরকে। উঃ সে কী আনন্দ রামানন্দের। শুধু দেখে ওর তৃপ্তি নেই। ও চাইল ঠাকুরকে প্রণাম করতে। আর যেই মাত্র হাত বাড়িয়েছে পায়ের দিকে ; ঠাকুর নেই।

আছাড় খেয়ে পড়ল বিছানায়। এখানে হাতড়ায় ওখানে মাথা কোটে, কোথাও পেল না। শেষে ঠাকুর য়েখানে বসেছিলেন, সেইখানে মাথা ঠেকিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো ফুঁপিয়ে কান্না।

'মাগো, সাধু হয়ে এতদিন কত ঘুরে বেড়ালাম, কিছুই পাইনি। ধ্যানজপ করি, তীর্থদর্শনে যাই—কিছুই দেখিনি। আপনার দয়ায় জীবন আমার ধন্য হল মা।...আমি যে সাদাচোখে দেখলাম মা, ঠাকুর এখানে বসে। আমার ঠাকুর কোথায় গেল মা—।'

কিছুতেই প্রবোধ মানে না ছেলেটা। কেবলই কাঁদে ফুলে ফুলে। গায়ে হাত বুলিয়ে, বুকে জপ করে, অনেক কষ্টে শান্ত করি। বলি, 'যাও বাবা শুয়ে পড়গে। ভোর হতে দেরি আছে। একটু বিশ্রাম কর।'

রামানন্দ ফিরে গেল তার বিছানায়। বাকী রাতটুকু বসেই কাটালাম। গুরুমার অভ্যাস খুব ভোরে শৌচে যাওয়া। মাটির ভাঁড়টা নিতে এলেন। দেখেন ভাঁড়ে দুধ।

'ওমা ভবতারিণী, রাত উপোষী থাকলি মা?'

গুরুমার আর দাঁড়াবার অবসর নেই। দুধসুদ্ধ ভাঁড় তুলে দিলাম। ছুটলেন তিনি।

স্নানাদি সেরে জপে বসলেন গুরুমা। রাতের দর্শন সব বললাম গুরুমাকে। আনন্দে বুড়ীর সারা শরীর থরথর করে উঠল। দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে বুড়ীর সে কি আদরের ঘটা।

'দেখলি ভবতারিণী, আমার মাকে দেখলি ত? আহা, মায়ের কি রূপ গো! রাঙা জবায় কি সাজে সেজেছে মা আমার।'

খুশীর আমেজে জপ উঠল বুড়ীর মাথায়। দিনভর ওই একই কথা। ভাবলাম বুড়ী না পাগল হয়ে যায়!

...বহুক্ষণ একটানা কথা বলে এতক্ষণে ফুরসত পেলেন বসুমতী-মা। আমাকে বললেন, 'শরীরে আর সয় না মা। ইচ্ছা ত হয় দিনরাত ঠাকুরের কথা বলি। এই দেখ না, আগে ছিল ঘাড়ের এইদিকে ব্যথা। আজ ক'দিন ব্যথাটা দু'দিকেই বেড়েছে। আমার আবার কথা বলার সময় ঘাড় নাড়া রোগ। বড় যন্ত্রণা হয় মা।'

আমি বললাম, 'তবে থাক মা আজ। এবার আপনি বিশ্রাম নিন।'

কথাটা মনঃপূত হল না মায়ের। বললেন, 'কি জানি মা, কাল যদি শরীর আরও খারাপ হয়। হয়ত আর বলাই হবে না। বরং একটু সংক্ষেপে বলি। তোমরা এসেছ কত আশা নিয়ে, কলকাতা থেকে। এই তো সেদিন তারাও এসেছিল স্বামী-স্ত্রী। কিছুক্ষণ বলার পর এমন যন্ত্রণা শুরু হল মা—আর পারলাম না। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল তারা।'

ফেরা আর হল না আমাদের। মা বলা শুরু করলেন:

বোম্বে থেকে যেদিন আমরা ফিরলাম...খারের আশ্রমে সে কি অবস্থা! সাধুরা সব বিশ্রাম নিচ্ছে দুপুরে। ভয়ানক গরম। মোহন্ত

ছিলেন নিজের ঘরে। কি মনে ভেবে যেন বাইরে এলেন। পায়ে পায়ে উঠলেন দোতলায়। দেওয়ালের হুকে লাগানো ছিল চাবি। ঠাকুরঘর খুললেন।

এ কি! ঠাকুরের একি সাজ!!

ডাক দিলেন মোহন্ত, 'গঙ্গাধর গঙ্গাধর··· ।'

গঙ্গাধর থাকে নিচের তলায়। মোহন্তর ঘরের পাশে। পড়িমরি করে হাজির হল গঙ্গাধর। জড়সড় হয়ে দাঁড়াল মোহন্তর সামনে। কর্কশকণ্ঠে মোহন্ত বললেন, 'কতদিন এখানে আছ গঙ্গাধর —এখনও ঠাকুর সাজাতে শেখনি। ঠাকুরের গলায় দিয়েছ জবার মালা। রক্ত-চন্দনের ফোঁটা দিয়েছ ঠাকুরের সারা গায়ে। সিঁদুর গোলা লেপেছ ঠাকুরের কপালে। রাশি রাশি জবা ছড়িয়েছ ঠাকুরের সিংহাসনে—। তোমার কি ভীমরতি হয়েছে গঙ্গাধর? কতদিন ঠাকুরের সেবা করছ, অথচ জান না—শ্বেতপুষ্পে পূজা হয় ঠাকুরের। সাদা ফুলের গোড়ে মালা থাকে ঠাকুরের গলায়। শ্বেতচন্দনে ভূষিত হয় ঠাকুরের সারা অঙ্গ।'

গঙ্গাধর বলে, 'মহারাজ, আমি ত এইভাবে ঠাকুরকে সাজাইনি।'

ধমক দেন মোহন্ত, 'ফের কথা বলছ। একবার তাকিয়ে দেখ ঠাকুরের দিকে। তুমি না সাজালে, এত জবা ফুল এল কি করে? মিথ্যা বলতে বাধছে না তোমার? ছিঃ ছিঃ গঙ্গাধর! এ নিশ্চয়ই বসুমতী-মার মতলব। জবাফুল, সিঁদুর এইসব এনে তোমাকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছেন। আমাকে একবার বলতেও পারলে না!'

রাগে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগলেন মোহন্ত। তাঁর চীৎকারে আশ্রমের সাধুরা এল ভিড় করে। সবাই দেখল, সিঁদুর মালা রাশি রাশি জবাফুল।

হতভম্ব গঙ্গাধর। মুখে তার কথা নেই। কিছুটা সামলে নিয়ে

মোহন্ত বললেন, 'দাঁড়িয়ে দেখছ কি? তাড়াতাড়ি ঠাকুরের বেশ পরিবর্তন করাও। এখনই লোকজনে'র আসা শুরু হবে।

মোহন্তের সঙ্গে সাধুরা সব নিচে নেমে এল। জলভরা চোখে গঙ্গাধর গেল ঠাকুরের কাছে। হাতে তার ভিজা তোয়ালে।...গোলা সিঁদুর আগুনের মতো লাল হয়ে আছে ঠাকুরের কপালে।

চারটার কিছু পরে পিয়ন এল আশ্রমে। তাঁর ঘরের সামনে একটা চেয়ারে বসেছিলেন মোহন্ত। রামানন্দের লেখা জোড়া-পোস্টকার্ডখানা পিয়ন দিলে মোহন্তর হাতে।

ভারী শরীর নিয়ে ছুটতে ছুটতে মোহন্ত আবার উঠলেন দোতলায় ঠাকুরঘরে। এদিক সেদিক কি যেন খুঁজছেন মোহন্ত। শেষে হাজির হলেন ঠাকুরের সামনে। না, কোথাও নেই। আবার সেই চীৎকার, 'গঙ্গাধর...গঙ্গা র।'

কাছাকাছি ছিল গঙ্গাধর। তখনই হাজির।

'কিছু পেয়েছ গঙ্গাধর এখানে?'

খুব ঘাবড়ে গেছে গঙ্গাধর। বুঝতে পারছে না, মোহন্ত কি খুঁজছেন। বলল, 'কি মহারাজ?'

রামানন্দ লিখেছে—মন্দির খোলার পর যদি কিছু দেখেন বা কিছু পান, পত্রপাঠ জববলপুরে জানাতে ভুলবেন না।...মোহন্ত ভেবেছেন, বসুমতী-মা নিশ্চয়ই ঠাকুর প্রাণামী দিয়ে গেছেন—হয় একটা নম্বরী নোট না হয় গিনি। গঙ্গাধরের উত্তরে খুব বিরক্ত হলেন মহারাজ। বললেন, 'কি পেয়েছ বল গঙ্গাধর। নম্বরী নোট, গিনি না মোহর?'

গঙ্গাধর ভয়ে দিশাহারা। কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'না মহারাজ, আমি কিছুই পাইনি।'

আর যায় কোথা। ফেটে পড়লেন মোহন্ত। মুখে যা এল তাই বলে গাল দিলেন গঙ্গাধরকে।

'ছিঃ ছিঃ, তুমি না সাধু হয়েছ। মিথ্যা বলতে লজ্জা হল না তোমার! এখনও বল কি পেয়েছ?'

টপটপ করে চোখের জল পড়ছে গঙ্গাধরের। মুখে তার কথা নেই। ঠিক যেন পাথরের মূর্তি।

সাধুর দল আবার এল ভিড় করে। রামানন্দের চিঠিটা সবাই পড়ল। তন্নতন্ন করে খোঁজা হল চারিদিকে। কোথাও পাওয়া গেল না।

ওরা সবাই নিচে নেমে এলেন। মন্দিরের নিচে বড় একটা ড্রামের মধ্যে ফেলা হয় পূজার বাসি ফুল। আরব সাগরের জল জোয়ারের সময় যখন এগিয়ে আসে মন্দিরের গায়ে, ড্রাম তুলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় সেগুলো।

কার মাথায় যেন বুদ্ধি এল, গঙ্গাধর ত এখনই ফেলে এসেছে রাশি রাশি জবাফুল ওই ড্রামের মধ্যে।···হৈ হৈ করে সবাই ছুটল।

না, সেখানেও নেই। ক্ষমাহীন মোহন্ত বসলেন পরামর্শ সভায়। গেরুয়া পরে মিথ্যা বলা!

ঠিক হল, রামানন্দকে লেখা হোক—বসুমতী-মা কি দিয়ে গেছেন। তারপর বেলুড় মঠে জানানো হবে সব। সুপারিশ করা হবে গঙ্গাধরের গেরুয়া কেড়ে নেওয়ার।

হায়রে কপাল! চিঠি পাওয়া মাত্র রামানন্দ লিখে দিল মোহন্তকে, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এমন কি জব্বলপুরে সেই রাত্রে ওর ঠাকুর দর্শন পর্যন্ত। বার বার করে লিখল, গঙ্গাধরের কোনো দোষ নেই। বড় সরল, বড় ভালমানুষ গঙ্গাধর। আরও লিখল, দু'চারদিনের মধ্যে আমরা ফিরে যাচ্ছি কাশীতে।

মার্বেলরক কালীবাড়ি আরও সব ঘুরে ঘুরে দেখি আর নর্মদায় স্নান করি। দু'চারদিনে আর হল না বাবা। কাশীতে ফিরলাম প্রায় পনেরদিন পরে।

ওমা! একগাদা চিঠি এসেছে বোম্বাই থেকে। মোহন্তর সে কি আকুল আহ্বান।

'মাগো, আর একটিবার আপনি এখানে আসুন। আপনার মুখে আমরা শুনব, ঠাকুর কেমন কালী হয়ে নেচেছেন। আমরা আপনার অভাগা সন্তান, মা আমাদের ডাকে আপনি কি সাড়া দেবেন না মা।'

আমাকে লিখেছে আবার রামানন্দকেও লিখেছে।

'ভাই রামানন্দ, মাকে নিয়ে অবিলম্বে চলে এস। তোমাদের সব খরচ আমরা দেব। লক্ষ্মী ভাই কথা রাখ।'

কিছুতেই মনস্থির করতে পারছি না। শেষে বাবা, প্রায় রোজই একখানা করে চিঠি আসতে লাগল। ভাবলাম, দূর ছাই—ছেলে যখন ডাকছে এত করে, ঘুরেই আসি।

ঠাকুরের বোধ হয় ইচ্ছা নয় বাবা, তাই শেষের চিঠিতে মোহন্ত লিখল, মাগো, এবার আর হল না। মঠের নির্দেশ, আমেরিকা যেতে হচ্ছে। মনের দুঃখ মনেই রইল।

সেবারে হল না বটে, তবে জান বাবা-শুভ ইচ্ছা একদিন না একদিন পূরণ হবেই। দু'দিন আগে আর পরে।

বছর দুই পরে সেই সুযোগ আবার এল। ডাক পড়ল বাঙ্গালোর-এ। রামানন্দ যাচ্ছে আমার সঙ্গে। হরিপ্রেমও জুটল।

সেখানেও মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা নেই। আশ্রমের পাশে এক ইন্‌জিনিয়ারের বাড়ি। ঠাকুরের ভক্ত সন্তান। উপরের মহল ছেড়ে দিলেন আমার জন্য।

খুব সুবিধা। পাশেই আশ্রম। যাতায়াতের ঝামেলা নেই। মন চাইলেই এসে বসি ঠাকুরঘরে।

যেখানেই যাব, চারটে করে ক্লাস নিতেই হবে। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে আসি ঠাকুরঘরে।

এখানকার মন্দির একতলা। সামনে চওড়া বারান্দা। দু'দিকে নেমে গেছে সিঁড়ি। মন্দিরের মুখোমুখি নাটমন্দির। সভাসমিতি ওখানেই হয়।

হঠাৎ সংবাদ এল মাদ্রাজ যেতে হবে। বড় মিটিং হবে সেখানে, দু'দিন পরে। আমাকে দিয়ে ঠাকুরের কথা বলাবে ছেলেরা।

মাদ্রাজ যাবার আগের দিন, শহরের ডাক্তার, উকিল, প্রফেসার, এরা সব ধরে বসল—মাকে কিছু বলতে হবে। পাছে বেশী ভিড় হয়, তাই মেয়েদের নিষেধ করল আসতে। ঠিক হল, সভা বসবে পাঁচটায়।

আজ আর বিকেলের ক্লাস নেই। দুপুর থেকে বসে আছি মন্দিরের বারান্দায়। ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ কিন্তু কাটা-পাল্লা থাকায় দেখার কোনো অসুবিধে নেই।

চেয়ে আছি ঠাকুরের দিকে। হঠাৎ নজর পড়ল, পিছনের দেওয়ালে গোলমতো কি একটা টাঙানো আছে। কি ওটা! অনেকক্ষণ দেখার পর মনে হল, 'ফল্‌স কলার'। কিন্তু কার ওটা? যতদূর জানি, স্বামীজী পরতেন—আর পরতেন অভেদানন্দ-স্বামী। হয়ত স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে ঝুলিয়ে রেখেছে ঠাকুরঘরে।

আমার ওই এক রোগ। মনে একবার যেটা আসবে, শুরু হবে কেবল গবেষণা। সেই একই চিন্তা—স্বামীজীর না অভেদানন্দ মহারাজের...।

তন্ময় হয়ে ভাবছি বাবা, হঠাৎ দেখি কলারের চারপাশে লালচে

আলো। কেউ কি আলো জ্বালল ঠাকুরঘরে! না দরজা ত বন্ধ। কিছুক্ষণের মধ্যে কলারের ভিতরটা দেখি দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে।···একটা লেখা ফুটে উঠল—ওঁ। পর মুহূর্তে দেখি, লেখা জ্বলছে···জয় রামকৃষ্ণ। ধীরে ধীরে সারা ঘরটা ভরে উঠল ওই আলোর জ্যোতিতে। তারপর শুনি, সুমধুর কণ্ঠে কে যেন গাইছে, জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ।

সুরের তরঙ্গে আর আলোর জ্যোতিতে আমায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল কোন এক অজানা লোকে। আমি বাবা, বেহুঁশ হয়ে গেলাম।

এদিকে সভার সময় হয়ে গেছে। ডাকের পর ডাক পাঠাচ্ছে মোহন্ত। সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে ছেলেরা ডেকেছে, সাড়া না পেয়ে ফিরে গেছে তারা।

হরিপ্রেমও এসেছিল ডাকতে। এমন বোকা—উপরে ওঠে নি। এলে সেও দেখতে পেত ওই আলোর ঝর্ণা।

অবশেষে মোহন্ত এলেন। বললেন, 'মা, বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। ছট্‌ফট্ করছে সবাই। আপনি আসুন মা।'

অনেক কষ্টে মনকে নিচে নামাই। বলি :

'তোমরা কেউ বল বাবা। আমি এখন পারব না বলতে।'

মোহন্ত মানে না। বলেন, 'তা কি হয় মা। আপনার মুখে ঠাকুরের কথা শুনবে বলে সবাই এসেছে। আপনি আসুন মা।'

ঠেকাতে পারলাম না বাবা। নেমে এলাম। এক ফাঁকে মোহন্তকে বললাম, 'তুমি ওদের বলে দাও বাবা, মন্দির যেন বন্ধ না করে। আমি আর একবার যাব প্রণাম জানাতে।'

তারপর বসুমতী-মা বলে চললেন তাঁর পুরাতন স্মৃতিকথা :

সভা শুরু হল। আমি কিছুক্ষণ বলি, একজন ইংরাজীতে তর্জমা

করে। আবার, আর একজন শোনায় ওদের ভাষায়। এইভাবে চলল রাত দশটা পর্যন্ত। তারপর যেই বসতে যাব—সবাই একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল। সমস্বরে দাবি তুলল, 'মা আরও বলুন। আরও বলুন।'

এইভাবে বলতে বলতে বাজল রাত দুটো। কী-ভাবের ঘোরেই ছিলাম বাবা সেদিন। শেষে জোর করে তুলে আনলেন মোহন্ত।

এলাম মন্দিরে। তাকিয়ে দেখি ঠাকুর বসে আছেন পদ্মাসনে। কোথায় সেই আলোর জ্যোতি! আর কোথায় বা সেই সুমধুর শব্দতরঙ্গ !!

ভক্তিভরে লুটিয়ে পড়লাম ঠাকুরের শ্রীচরণে।···কোলেপিঠে চেপে মানুষ হয়েছি ঠাকুরের। তখন কি জানতাম, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন মানুষের দেহ ধরে এসেছেন আমাদের উদ্ধার করতে।

এবার মা ফিরে এলেন তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবনের অধ্যায়ে। বললেন :

জান বাবা, মা নাম রেখেছিল, হাবী। শাশুড়ী ডাকতেন, ক্ষেপী বলে। আসলে, আমি ক্ষেপীই ছিলাম। হাবা ক্ষাপা না হলে কেউ কি পারত, তাঁর উপর অত অত্যাচার করতে।

আট বছরের বৌ। শ্বশুরবাড়িতে কাজকর্ম কেউ করতে দেয় না। ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াই শাশুড়ীর পায়ে পায়ে। মানুষ ত দু'জন—মামাশ্বশুর আর আমার বর। নারায়ণের ভোগ হয়ে যায় সকাল সকাল। খেয়েদেয়ে যে যার বেরিয়ে গেলেন। তারপর, ফাঁকা বাড়ি পেয়ে শাশুড়ীর কোলে বসে গল্প শুনি। শাশুড়ী বলেন,

'হ্যাঁরে ক্ষেপী, ঠাকুর ত ঘন ঘন তোদের বাড়ি যান—তোকে কত আদর করেন···।'

আমি বলি, 'হ্যাঁগো, আমায় কি ভালটাই বাসে। ঠাকুরের

কাছে যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। কোলে চাপিয়ে নিয়ে যেতেন রামদাদার বাড়ি। কখনও আবার দক্ষিণেশ্বরে গাঁদাফুলদিদির কাছে।'

গালদুটো টিপে বুকে জড়িয়ে শাশুড়ী বললেন, 'শোন ক্ষেপী, এবার যখন যাবি, ঠাকুরকে বলবি শাশুড়ী বলেছে, মন্তর দিতে হবে।'

চাইতে হবে শুনে মনটা আমার দমে গেল বাবা। যখনই যাব বাপের বাড়ি, শাশুড়ী বলে দেবে, 'ক্ষেপী, এবার আসার সময় বালা আনবি একজোড়া।'

মাকে বলি বাড়ি এসে। যাবার সময় নতুন বালা পরে শ্বশুর-বাড়ি যাই। বেশী-দিন থাকতে পারি না সেখানে। যেই কান্না শুরু করি মায়ের জন্য, পাঠিয়ে দেয় শাশুড়ী। যাবার সময় বলে দেয়, 'ক্ষেপী, তোর কানে চারগাছা মাকড়ি। এবার, আরও দু'গাছা মাকড়ি পরে আসবি।'

মাকে এসে বলি। ফেরার সময় কানভর্তি মাকড়ি পরিয়ে মা পাঠায়। এইভাবে কখনও রূপার গোট, কখনও তোড়া, একটার পর একটা। শেষে, মাকে একবার বললাম, 'দু-তিন রকম মিষ্টি পাঠাও কেন? শাশুড়ী বলেছে, অত কম মিষ্টি দিলে কি চলে—। পাঁচবাড়ি বাঁটা যায় না। একরকম মিষ্টি বেশী করে দেবে।'

যেই না বলা, মায়ের সে কি রাগ বাবা। রাগে যেন ফেটে পড়ল মা। বলল, 'তখনই বলেছিলাম, দেব না মেয়ের বিয়ে গরীবের ঘরে। যা চাচ্ছে তাই দিচ্ছি, তবুও কাঙালপনা! ছিঃ ছিঃ···।'

সেদিনের সেই রাগ দেখে মায়ের, আমি বাবা, পাথর হয়ে গেলাম। কাউকে কিছু চাইবার কথা উঠলে, মায়ের মুখখানা মনে পড়ে যায়। বুক দুরদুর করে। তাই শাশুড়ী যখন বলল—মন্তর নিয়ে আসবি ঠাকুরের কাছ থেকে, আমি বাবা হ্যাঁ না কিছুই বললাম

না। আর আমি কি ছাই তখন জানি, মন্তর কি বস্তু। ভেবেছি গয়নাগাটি বা হবে।

ক'দিন পরে এলাম মায়ের কাছে। শাশুড়ীর কথা পারছি না আর মাকে বলতে। একদিন দিদিকে বললাম, 'হ্যাঁরে, ঠাকুর আর আসেন নি ?'

মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল দিদি। যাবার সময় চিপটেন কেটে বলল, 'মরণ আর কি। দুদিন গেল না, হেদিয়ে ম'ল বরের চিন্তায়। গলায় দড়ি।'

বুঝলে না বাবা, ওদের ধারণা—আমার বর যায় ঠাকুরের কাছে হামেশা, দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুর এলে বরের কথা শুনতে পাব। আমি ত অতশত বুঝি না। একদিন বৌদিকে বললাম, 'হ্যাঁগো বৌদি, ঠাকুর কবে আসবে ?'

বৌদি করল কি বাবা! রান্নাঘরে ছিল মা, টানতে টানতে নিয়ে এল আমায় রান্নাঘরে—মায়ের কাছে। তারপর! ফুলে ফুলে সে কি হাসির ঘটা। কোনোরকমে সামলে নিয়ে মাকে বলল,

'মা, আপনার জামাইকে আনতে পাঠান।'

বরের কথা শুনবে বলে মেয়ে আপনার কেবলই খোঁজ নিচ্ছে ঠাকুরের। ও বাবা, মাও দেখি হাসছেন মুখ টিপেটিপে।

দু'দিন যায় চারদিন যায় ঠাকুরের আর দেখা নেই। এদিকে ফেরার দিন এগিয়ে আসছে। শাশুড়ী বলে পাঠিয়েছে—মন্তর নিয়ে যেতে। কখন বলব ঠাকুরকে। মন্তর গড়াতে কতদিন লাগবে তাই বা কে জানে।

একদিন, সকালের দিকে আমি আছি দো'তলার ঘরে। একটা ভিখারী খুউব চেঁচাচ্ছে সদরগোড়ায়। নিচে না আছে দিদি আর

না আছে বৌদি। ডাক দিলেন মা আমাকে রান্নাঘর থেকে। 'ভবি, এক বাটি চাল নিয়ে আয় ভিক্ষাহাঁড়ি থেকে।'

…একবাটি চাল ভিখারিকে! বিশ্বাস করা যায় না এ'কালে।

বসুমতী-মা'র কথা শুনে স্বামীর মুখের দিকে তাকাই আমি। বুঝতে পারলেন মা। বললেন: যজমানের দেওয়া ভিজা আলোচাল ডাঁই হয়ে থাকত। আর আমরা বাটি বাটি দিতাম ভিখারিদের।

হ্যাঁ, শোন বাবা, মাকে ভাল যেমন বাসতাম আবার ভয়ও করতাম যমের মতন। যেই না মায়ের ডাক শুনেছি হাতের কাজ ফেলে নিচে এলাম।

বাটির চাল ভিখারিকে দিয়ে যেমন ঘরে ঢুকেছি, দেখি, ঠাকুর বসে আছেন তক্তপোশে বৈঠকখানায়।

'ওমা, তুমি!'

ঝাঁপিয়ে পড়লাম ঠাকুরের বুকে। গলা পেঁচিয়ে বুকে ঝুলছি আমি। হাত থেকে বাটিটা নামিয়ে ঠাকুর তুলে নিলেন আমায় কোলের উপর। তারপর সে কী আ· রের ঘটা—।

আমার কিন্তু ওদিকে মন নেই। শাশুড়ী বলেছে, মন্তর নিয়ে যেতে। আমার মাথায় ওই এক চিন্তা। ঠাকুরের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বললাম, 'আমায় মন্তর দিতে হবে। শাশুড়ী বলেছে, ঠাকুরের কাছে মন্তর চাইবি। তুমি আমায় মন্তর দাও।'

আমার মুখে মন্তর চাওয়ার কথা শুনে ঠাকুরের সে কী হাসি। বললেন, 'মন্তর! সে আমি কোথায় পাব রে?'

আমি বললাম, 'তা জানি না। মন্তর তোমায় দিতেই হবে।'

আরও জোরে সেঁটে ধরলাম আমার মুখখানা ঠাকুরের বুকে। চিবুকটা আমার মাথায় ঠেকিয়ে ঠাকুর বললেন, 'তাই ত ভবতারিণী, মন্তর আমি কোথায় পাই বলত?'

আমার মুখে কেবল ওই একই কথা, 'কোন কথা শুনব না। মন্তর আমার চাই-ই।'

ঠাকুর যত এড়িয়ে যেতে চান, আমার জিদ ততই বাড়ে। শেষে অনেক ভেবেচিন্তে ঠাকুর বললেন, 'কি মন্তর তোর শাশুড়ী বলেছে, বল না?'

আমি বলি, 'তা জানি না। বলেছে, ঠাকুরকে বলবি মন্তর দিতে। মন্তর তোমায় দিতেই হবে।'

মহা ভাবনায় পড়লেন ঠাকুর। অথচ এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। বললেন, 'কি করি বলত ভবতারিণী—মন্তর এখন আমি কোথায় পাব···।'

আমি তখন খুব ক্ষেপে গেছি বাবা। যেই না বলা—আমি কোথায় পাই, ঠাকুরের কোমরের কাপড় ধরে টানাটানি করছি। আর কেবলই বলছি, 'মন্তর আমার চাই-ই চাই।'

ঠাণ্ডা করার জন্য আমার মাথায় হাত বুলাচ্ছেন ঠাকুর। হাসতে হাসতে বললেন, 'হ্যাঁরে ভবতারিণী, তুই শিবঠাকুর দেখেছিস?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিই, 'হ্যাঁ দেখেছি। কত শিবলিঙ্গ আছে জগন্নাথ ঘাটে। গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার পথে মা জল ঢালেন শিবের মাথায়।'

ঠাকুর আবার বললেন, 'হ্যাঁরে ভবতারিণী, তুই শিবঠাকুর ভালবাসিস?'

আমি ভাবলাম, ভালবাসি বললে ঠাকুর হয়ত মন্তর দেবেন। বললাম, 'হ্যাঁ, খুউব ভালবাসি। দাও, মন্তর দাও।'

কসির কাপড় ছেড়ে দিয়ে টান দিই ঠাকুরের বুকের চুল ধরে। আস্তে আস্তে মুঠি আলগা করে দেন আমার। ঠাকুর এবারে বললেন, 'হ্যাঁরে ভবতারিণী, তুই কালীঠাকুর ভালবাসিস?'

ঘাড় কাত করে বলি, 'খুউব ভালবাসি।'

ভালবাসি না ছাই। ঐ ত ঠাকুর, এক হাত জিভ বার করে দাঁড়িয়ে আছে শিবের বুকে। কিন্তু কি করব, ভাল না বাসলে ঠাকুর যদি মন্তর না দেন।

চুপ করে আছেন ঠাকুর। ভাবলাম, এবার নিশ্চয়ই দেবেন। না, হল না। এবার বললেন, 'হ্যাঁরে ভবতারিণী, তুই দুর্গা ঠাকুর দেখেছিস ?'

বললাম, 'হ্যাঁ দেখেছি। দশ হাত, সিংহের পিঠে দাঁড়িয়ে দু'দিকে লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ।'

আমাদের যজমানদের বাড়ি পূজা হয়। কত নিমন্ত্রণ খেয়েছি। পূজার সময় নতুন কাপড় পরি। আবার প্রশ্ন ঠাকুরের, 'হ্যাঁরে ভবতারিণী, তুই কেষ্ট ঠাকুর দেখেছিস ?'

তাড়াতাড়ি বলি, 'হ্যাঁ। মায়ের সঙ্গে গিছলাম খড়দ'র শ্যামসুন্দর দেখতে। গঙ্গার ধারে মন্দির। কত লোকজন···।'

জান বাবা, ঠাকুর যা বলছেন আমি তাইতেই সায় দিচ্ছি। আমার কেবল এক বায়না, মন্তর দাও। কোনোরকমে নিস্তার না পেয়ে ঠাকুর শেষে বললেন, 'ভবতারিণী—তুই রামসীতা দেখেছিস।'

এবার আর জবাব দিতে পারি না। মনে মনে ভাবি, তাইত, রামসীতা কি ঠাকুর রে বাবা। চুপ করে আছি দেখে ঠাকুরের কি মজা! হাততালি দিয়ে বললেন, 'এমা, ভবতারিণী রামসীতা দেখে নি। দুয়ো, ভবতারিণী রামসীতা দেখে নি।'

আমি বাবা পড়লাম মহা ভাবনায়। রামসীতা। রামসীতা কি ঠাকুর কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আর ঠাকুর ততই হাসছেন আর হাততালি দিয়ে বলছেন, 'ভবতারিণী হেরে গেল—রামসীতা দেখে নি, ভবতারিণী রামসীতা দেখে নি···।'

হঠাৎ দপ্ করে মনে পড়ল আমার। ডান হাত দিয়ে চেপে ধরলাম ঠাকুরের মুখখানা। বললাম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি রামসীতা ঠাকুর। মায়ের ঘরে ছবি টাঙানো আছে। রাম, তার বৌ সীতা, ভাই লক্ষ্মণ।'

ঠাকুরের ঠোঁটে তখনও মিষ্টি হাসিটুকু জড়িয়ে আছে। বললেন, 'তুই রাম ঠাকুরকে ভালবাসিস, ভবতারিণী?'

একই কথা বার বার বলতে আর পারি না। বললাম, 'খুউব ভালবাসি। দাও না তুমি আমায় মন্তর।'

কি জানি কেন, হঠাৎ ঠাকুর বলে বসলেন, 'ভবতারিণী, তুই আমায় ভালবাসিস?'

কথাটা আচমকা এমন বললেন ঠাকুর, আমি বাবা ঠিক ধরতে পারলাম না। ঠাকুরের গলা জড়িয়ে মুখটা চেপে ধরলাম ঠাকুরের বুকে। তারপর ফিসফিস করে বললাম, 'ভালবাসি, ভালবাসি, তোমাকে আমি খুউ-ব ভালবাসি।'

ঠিক সেই সময় কে একজন এল রামদাদার বাড়ি থেকে, ঠাকুরকে নিয়ে যেতে। কোল থেকে আমায় নামিয়ে দিলেন ঠাকুর। বললেন, 'দেব রে দেব। পরে একদিন তোকে দেব মন্তর।'

আমি বললাম, 'তোমার কাছে এখন নেই বুঝি! গড়াতে হবে?'

মুচকি হেসে ঠাকুর চলে গেলেন রামদাদার বাড়ি। দু'চার দিন পরে শ্বশুরবাড়ি ফিরে এলাম।

এখানে এলে মন কেবলই হুহু করে বাবা। আর কেবলই কাঁদি। শাশুড়ী বোঝায়, মামীশাশুড়ী আদর করে। কিন্তু কান্না আর কমে না। পাড়ার বৌ-ঝিরা মজা করে আমাকে নিয়ে। আমার কাছে এসে কত মিষ্টি কথা—

'আহা, দুধের মেয়ে শ্বশুর ঘর করতে এসেছে। কাঁদবে না গা। বাপ-মায়ের জন্য কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। কি বউ-কাঁটকী শাশুড়ী

গো ! এমন কচি বউটাকে টেনে আনল বাপের ঘর থেকে। ওর এখন পুতুল খেলার বয়স··· !'

ওদের কথা শুনে আরও কাঁদি বাবা। মনে হয়, ওরা যেন আমার কত আপনজন।

ওই ওরা, আবার আড়ালে শাশুড়ীকে বলে, 'আদিখ্যেতা দেখনা মেয়ের। দিন রাত চোখ দিয়ে আমানি ঝরাচ্ছে। শ্বশুরঘর করবি না ত মা বিয়ে দিল কেন ? ঘরে রাখলেই ত পারত।···একই সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আমাদের সেজ বোয়ের। দেখত দিদি, নেটিপেটি হয়ে কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে শাশুড়ীর পায়ে পায়ে। পানজল দিচ্ছে মানুষ-জনকে। ও বৌ তোমার ঘর করবে না দিদি। বাপের বাড়ি বসিয়ে দিয়ে এস। ছেলের আবার বিয়ে দাও।'

কথাটা শুনি আর শিউরে উঠি, আর কান্নায় ভেসে যায় বুক। শলাপরামর্শ হয় শাশুড়ী আর মামীশাশুড়ীতে। ঠিক করেন, বৌকে আর পাঠানো হবে না বাপের বাড়ি।

কিন্তু কান্না ত থামাতে হবে। তাই মাঝে মাঝে নিয়ে চললেন আমাকে এখানে ওখানে। কোনোদিন হয়ত নবরত্ন মন্দিরে আবার কখনও বা মদনমোহনতলায়। আর এ ছাড়া দক্ষিণেশ্বর ত আছেই।

শাশুড়ী মামীশাশুড়ী দু'জনেই ঠাকুরের কৃপা পেয়েছেন। বিশেষ করে মামীশাশুড়ী। আমার বরের জন্য মামীশাশুড়ীর কি কম হেনস্তা হয়েছে বাবা! ছেলেমানুষ আমার বর। দলে পড়ে যায় দক্ষিণেশ্বরে। মামাশ্বশুর মহাখাপ্পা। বকাঝকা করেন ভাগ্নেকে। শোনে না, ফাঁক পেলেই পালায়। শেষে একদিন বন্ধ করে রাখলেন ঘরে। ছেলের কান্না দেখে তালা খুলে দিলেন মামীশাশুড়ী। ব্যাস্। ছেলে সেই দিনই পালাল।

বাড়ি ফিরে মামা দেখল ভাগ্নে নেই। বাপ-মা তুলে যাচ্ছেতাই

করে গালাগাল দিলেন মামীশাশুড়ীকে। তাতেও হল না, কঠিন দিব্য দিয়ে বললেন—ভাত না দিয়ে ছাই দেবে বেড়ে।

ভাগ্নে ফিরল অনেক বেলায়। স্নান সেরে ভাত চাইল মামীর কাছে। আমার শাশুড়ী আছেন ভায়ের ভাতে। কোনো কথাতেই থাকেন না। মুখটি নীচু করে বসে আছেন। আমার বর কিছুই জানে না। বার বার তাগিদ দিচ্ছে মামীকে, ভাতের জন্য। ক্ষুধায় ছট্‌ফট্ করছে বেচারা।

ভাতের থালা সামনে বসিয়ে মামী ঢুকলেন রান্নাঘরে। ছেলে দেখে, থালার কোণে ঘুঁটের ছাই!

·· মামীর মুখে সব শুনল। তারপর, মামী যত কাঁদে ভাগ্নেও তত।

ছাই সরিয়ে সেই ভাতই খেল আমার বর। তারপর শপথ করল মামীর কাছে, শেষবারের মতো দক্ষিণেশ্বরে যাবে আজ। ঠাকুরকে বলে আসবে—আর সে যাবে না তাঁর কাছে।

···তখনও বিকাল হয় নি। ঠাকুর বসে আছেন নিজের ঘরে, ছোট খাটের উপর। আমার বর ঘরে ঢুকতেই ঠাকুর বললেন, 'তোদের বাড়িতে নারায়ণ আছে, নারে উপেন?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল আমার বর।

'একদিন প্রসাদ খাওয়াবি আমায়?'

কি জবাব দেবে ভেবে পায় না আমার বর। সে যে গেছে ঠাকুরকে বলতে—আর সে আসবে না ঠাকুরের কাছে। অথচ ঠাকুর নারায়ণের প্রসাদ খেতে চাইছেন।

সব ভুলে গেল আমার বর। ভুলে গেল, আজই সে শপথ নিয়েছে মামীর কাছে···।

প্রসাদ আনার সম্মতি জানিয়ে, ঠাকুরকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরল।

এদিকে ঘরবার করছেন মামীশাশুড়ী। সন্ধ্যা হয়ে এল। ফিরে যদি দেখেন ভাগ্নে নেই মামাশ্বশুর কুরুক্ষেত্র বাধাবেন। ছেলে বাড়ি ঢুকতেই মামী এলেন ছুটে। বললেন, 'কি রে, বলে এসেছিস ত? কি বললেন তোর ঠাকুর?'

জবাব দেবে কি আমার বর কেঁদেই সারা। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বলল, 'বলা হল না মামীমা। ঠাকুর আগেভাগে জানতে চাইলেন—তোদের বাড়িতে নারায়ণ আছে? একদিন প্রসাদ খাওয়াবি আমায়?'

ভয়ে ভয়ে আমার বর তাকাল মামীর মুখের দিকে। বলল, 'তোমার মত না নিয়ে আমি রাজী হয়েছি প্রসাদ নিয়ে যেতে—।'

কার মত কে নেয়…। কি খেলাই যে ঠাকুর খেললেন কে জানবে বাবা।

ভোরে উঠে স্নান সেরে মামী ঢুকলেন, রান্নাঘরে। পাঁচ ব্যঞ্জন পিঠে-পায়েস—তৈরি হল নারায়ণের ভোগ। পুরোহিত ডেকে তাড়াতাড়ি উৎসর্গ করানো হল। তারপর, কর্তা যেই না কাজে বেরুলেন—মামী বসলেন ভোগ বাড়তে। আঁচলের খুঁট খুলে চারটা পয়সা দিলেন আমার বরকে। বললেন, 'বাবা উপেন, শেয়ারের গাড়িতে যাবি। দেরি করিস না যেন।'

ঠাকুর তখন সবে খেতে বসেছেন নিজের ঘরে। দু'চারটি ছেলেও আছে। প্রসাদ দেখে ঠাকুরের সে কী আগ্রহ।

'কিরে এনেছিস প্রসাদ? দে দে আমাকে দে।' নিজের হাতে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিলেন ছেলেদের। নিজেও নিলেন। তারপর, চেটেচেটে পায়েস খাচ্ছেন আর বলছেন, 'আহা' কি সুন্দর রান্না রে উপেন তোর মামীর। নারায়ণ সত্যই গ্রহণ করেছেন এই ভোগ।'

ছেলের মুখে মামী শুনল ঠাকুরের তৃপ্তির কথা। আনন্দে ভরে

উঠল সারা অন্তর। তারপর থেকে আবার শুরু হল আমার বরের আনাগোনা ঠাকুরের কাছে।

আর একদিন মামী বলেন, 'ও উপেন, আজ ঠাকুরকে ভোগ দিয়েছি গোকুলপিঠে। যা না বাবা একবার দক্ষিণেশ্বরে।'

ছেলেও মহাখুশী। এইভাবে কখনও চিড়ের পিঠে, কখনও রাঙা-আলুর পান্তুয়া, যখন যা ভাল হয় নিয়ে ছুটতে হয় আমার বরকে। কে তাকে আটকায়।

আর বাবা, শুধু কি ছেলেকেই টানলেন ঠাকুর! ছেলের সঙ্গে মামী ও মা দু'জনেই।

বাপের বাড়ি যাওয়া বন্ধ। কিন্তু ঠাকুরের কাছে ওরা দু'জনে যান মাঝে মধ্যে। সঙ্গে থাকি আমি। ঠাকুরের কাছটিতে বসে থাকি। আটবছরের মেয়ে একগলা ঘোমটা। তারই মাঝে কেঁদে চলেছি হাপুস নয়নে। শাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করেন ঠাকুর, 'কিগো উপেনের মা, বৌ পছন্দ হয়েছে?'

শাশুড়ী বলেন, 'হ্যাঁ বাবা, কি লক্ষ্মী বৌ আমার। ঘর আলো করে আছে। বৌমার আমার সব ভাল কিন্তু কেবলই কাঁদে।'

ঠাকুর বললেন, 'কাঁদুক কাঁদুক। কান্না ভাল। মনের ময়লা সাফ হয়ে যাবে।'

কাছে ছিল হৃদয়। খেঁকিয়ে উঠল, 'কেন কাঁদিস ভবতারিণী। শ্বশুর-ঘর করতে হবে না?'

ব্যাস্, আর আমি যাই কোথা। শুরু হল আমার ক্ষ্যাপামি। বললাম, 'কাঁদবে নে···। ঐ তো এতটুকু হাঁড়িতে ওদের রান্না হয়। একমুঠা দু'মুঠা করে ওরা ভাত বাড়ে। টুকুটুকু ওরা তরকারি রান্না করে—।'

আমাদের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট বালিকার মতো বলে চললেন

বসুমতী-মা : হ্যাঁগো বাবা। বড় সংসারের মেয়ে আমি। এই এত বড় তিজেল হাঁড়িতে আমার মা ভাত রান্না করে। বড় বড় কড়ায় রান্না হয় ডাল তরকারি। আর আমার শ্বশুরবাড়িতে হত যেন খেলাদালির রান্না। আমার মন ভরবে কেন!

আবার ফিরে গেলেন দক্ষিণেশ্বরের প্রসঙ্গে। বললেন : আমাকে ভোলাবার জন্য হৃদয় শাশুড়ীকে বলল—'তবেই ত। মেয়ে কি এমনই কাঁদে। কেন তোমরা ছোট হাঁড়িতে রান্না কর। মেয়ের আমার পেট ভরে না নিশ্চয়ই।'

আমি বাবা অতশত বুঝি না যে ওরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছে। সরল মনে আমি বলি, 'না না আমি ত পেট ভরে খাই। ওরা কেন পাখির আহার করবে?'

হৃদয় আবার বলল আমার শাশুড়ীকে, 'ঠিকই ত। বেশী বেশী করে খেতে হবে তোমাদের। তাহলে ভবতারিণী আর কাঁদবে না।'

পরের বার যখন গেছি, ঠাকুর আবার বললেন আমার শাশুড়ীকে, 'কি গো উপেনের মা, বৌ কেমন?'

শাশুড়ী বললেন, 'বড় লক্ষ্মী বৌ বাবা। তবে ভীষণ কান্নাকাটি করে।'

ঠাকুর আবার হেসে বললেন, 'কাঁদলে মনের ময়লা সব সাফ হবে।' এবারেও হৃদয় ছিল। তেড়ে উঠল আমায়—'কেন কাঁদিস ভবতারিণী। মন পেতে থাকতে হবে। কাঁদলে কি চলে।'

আমি বাবা সমান তালে উত্তর দিই, 'কাঁদবে না···। ওরা কেন ছোট ছোট মাছ কিনে আনে। পুঁটি খলসে এই সব মাছ খাওয়া যায়?'

আমাকে খুশী করার জন্য হৃদয় বলল আমার শাশুড়ীকে—'ঠিকই ত, কেন তোমরা কুচো মাছ আন। মেয়ের গলায় কাঁটা বিঁধবে না?'

সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম, 'না না আমায় ত মাছের কাঁটা বেছে দেয়। ওদের যদি গলায় লাগে!'

আর একদিন, শাশুড়ীদের সঙ্গে গেছি ঠাকুরের কাছে। ঘরভর্তি মেয়ের দল। ওরা সব এসেছে উত্তরপাড়া থেকে।

প্রণাম করে ঘন হয়ে বসলাম ঠাকুরের পাশটিতে। ঠাকুর এবারও জিজ্ঞাসা করলেন শাশুড়ীকে, 'কি গো উপেনের মা, বৌ কেমন?'

একমুখ হেসে শাশুড়ী বললেন, 'লক্ষ্মী বৌ পেয়েছি বাবা আপনার দয়ায়। তবে, কান্নাকাটির বিরাম নেই। কিছুতেই ভোলাতে পারছি না।'

ঠাকুর এবারও বললেন, 'কাঁদুক। মনের ময়লা ধুয়ে যাবে।'

আজ আর হৃদয় নেই। উত্তরপাড়া থেকে যারা এসেছে, তাদের মধ্যে গিন্নি-বান্নি একজন, বললেন, 'কাঁদ কেন মা। মন দিয়ে কাজকর্ম শিখে নাও শাশুড়ীর কাছে। ওই ঘরই ত করতে হবে মা।'

সাধে কি আর ক্ষেপী বলে আমায়। ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললাম, 'ওদের বাড়ি আর থাকব না। ওদের ঘরের দেওয়াল থেকে সিঁদুর ঝরে। বাঁশের ঠেকো দিয়ে রেখেছে ঘরের মধ্যে।'

বুঝতে পারল না কেউ। সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। আমি কি তখন জানি বাবা, নিজেদের দুঃখ-দৈন্য কারুর কাছে প্রকাশ করতে নেই!

এদিকে শাশুড়ীর মুখ কাল হয়ে উঠল। কৈফিয়তের সুরে ঠাকুরকে বললেন, 'পুরাণ বাড়ি আমাদের। নোনা ধরেছে দেওয়ালে। ইটের গুঁড়ো মেঝেতে ঝরে পড়ে। বৌ মা ভাবে, বুঝি সিঁদুর। আর, আমার ঘরের ছাদে দু'টা বরগা খসে গেছে। তাই, বাঁশের ঠেকো দিয়ে রেখেছি। যাতে টালি না খসে পড়ে। একটু চোখের

আড়াল পেলেই পাঁই-পাঁই ঘুরবে বৌমা ওই বাঁশের গায়ে হাত লাগিয়ে। আজ সকালে খুব বকেছি—তাই এত রাগ!'

একঘর লোকের মাঝে মাথা কাটা গেল শাশুড়ীর। রাগে দুঃখে চোখ লাল হয়ে উঠল। অভিমান করে ঠাকুরকে বললেন, 'ও যখন শ্বশুরঘর করবেই না, থাক বাবা ও আপনার কাছে। বুঝিয়ে-সুজিয়ে মাথাটা ঠাণ্ডা করে দিন। তারপর পাঠাবেন।'

কি জানি কেন, ঠাকুর উঠিয়ে দিলেন আমাকে ঘর থেকে। বললেন, 'যা ভবতারিণী, ন'বতে যা।'

আমি বাবা মহাখুশী। একদৌড়ে হাজির হলাম ন'বতে। গাঁদাফুলদিদি ঘরেই ছিলেন। আমাকে পেয়ে কি আহ্লাদ! বললেন, 'কখন এলিরে ভবতারিণী···। শাশুড়ীর সঙ্গে এসেছিস বুঝি? ওমা! কতবড় হয়েছিস গো—মাথায় ঘোমটা দিয়ে শ্বশুরঘর করছিস।'

কত কথা, কত আদর। একডালা মুড়ি-মুড়কি দিয়ে বললেন, 'বোস্ এখানে পা ছড়িয়ে। পেট ভরে খা।'

মনের আনন্দে মুঠামুঠা মুড়ি খাচ্ছি আমি। সন্ধ্যা হয়। শাশুড়ী এলেন। গাঁদাফুলদিদিকে প্রণাম করে বললেন, 'মাগো, ক্ষেপীকে আপনার কাছে রেখে গেলাম মা। ঠাকুর বলেছেন, চারদিন পরে পাঠিয়ে দেবেন।'

চলে গেলেন শাশুড়ী। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। গাঁদাফুল দিদিকে জিজ্ঞাসা করি, 'হ্যাঁ দিদি, চারদিন কবে শেষ হবে?'

হাসতে হাসতে গাঁদাফুলদিদি বললেন, 'আজ বৃহস্পতিবার। শুক্র, শনি, রবি আর সোম।'

হাততালি দিয়ে নেচে উঠলাম। গালদু'টো টিপে দিয়ে গাঁদাফুলদিদি বললেন, 'হাউড়ী মেয়ে।'

আমাকে আর পায় কে। মুড়ির ডালা হাতে নিয়ে বেরিয়ে

পড়লাম। মন্দিরের পূর্ব দিকে থাকে আমার খেলুড়েরা—সুখদা মোক্ষদা দু'বোন।

আমাকে দেখে দৌড়ে এল তারা। বলল, 'কিরে ভবি, কবে এলি? থাকবি ত ক'দিন?'

ঘাড় নেড়ে বললাম, 'আজ বৃহস্পতিবার। দিদি বলেছে শুক্র, শনি, রবি, সোম, চারদিন থাকব। খুউ-ব খেলব তোদের সঙ্গে।'

···রাত্রে শুলাম দিদির পাশে। সকালে উঠে ভাবলাম, যাই দাদার কাছে। সেই যে সেবারে দেখেছিলাম, দাদার গা থেকে কেমন আলো বেরুচ্ছে—আমাদের বৈঠকখানায়·। দিদি বলেছিল তখন, ব্রহ্মদৈত্যের গা দিয়ে নাকি ওইরকম আলো বেরিয়ে আসে। দাদাকে জিজ্ঞাসা করব, সত্য কি না।

ঝোঁক উঠলে আর নিস্তার নেই। বেরিয়ে পড়লাম। দাদার ঘর বন্ধ। ভিতরে গেলাম, দেখি দাদা নেই। চললাম রাস্তার দিকে। না, সেখানেও নেই। গেলাম চাঁদনীর ঘাটে—স্নান করছে মানুষজন। সেখানেও পেলাম না দাদাকে। উঠান পেরিয়ে এলাম মন্দিরের দরজায়।

ওমা! দেখি দাদা বসে আছেন মায়ের মুখোমুখি। পূজা করছে অক্ষয়। কলকাতা থেকে এসেছে বেনেদের মেয়েরা মানসিক শোধ দিতে।

পূজা শেষ হল। ঘটের মাথায় লালপাড় একখানা শাড়ি ভাঁজ করে রাখা আছে। বিলাতি শাড়ি, বড় সুন্দর বাবা।

ঠাকুর অক্ষয়কে বললেন, 'শাড়িটা ভবতারিণীর হাতে দে অক্ষয়।'

ঘট থেকে উঠিয়ে শাড়িটা ঝুলিয়ে দিল অক্ষয় মা ভবতারিণীর হাতে। ঠাকুর মুচকি হাসলেন। ইসারা করে দেখিয়ে দিলেন আমার দিকে।

ঝিকেয় নিয়ে এল শাড়িটা ঁাটি পাকিয়ে, দাঁড়িয়ে আছি আমি। কিছুতেই নেব না। ঠাকুর বললেন, 'নে ভবতারিণী। শাড়িটা পরে ফেল।'

বয়ে গেছে আমার। জান বাবা, যজমানদের ঘর আমাদের। পাওনা লালপাড় শাড়ি ছাড়া কখনও পরতে পাই নি। ঘেন্না ধরে গেছে লালপাড়ে।

শ্বশুরবাড়ি এসে কালাপাড় শাড়ির মুখ দেখেছি। এই কাপড় ছেড়ে ওই লালপাড় শাড়ি পরতে মন উঠছে না।

ঠাকুর বললেন। যারা মানসিক শোধ দিতে এসেছে, তারাও বলল। আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে আছি কাঠ হয়ে। শেষে বাবা, ঠাকুর নিজের হাতে আমায় পরিয়ে দিলেন নতুন শাড়িটা।

শাড়ি ত পরলাম, কিন্তু ভয় হচ্ছে—যদি কালাপাড় শাড়িটা নিয়ে নেয় ওরা। ঠাকুর যত টানছেন, আমি তত আঁকড়ে ধরে আছি। শেষে হাসতে হাসতে ঠাকুর বললেন, 'এ ত বেশ জ্ঞান হয়েছে মেয়ের, নিজের বলে। আর একে কি না ওরা বলে সংসার করবে না।'

শাড়ি নিয়ে ফিরে এলাম ন'বতে। ঠাকুর সারাদিন থাকলেন ওখানে। পূজার পর রান্না হল। ভোগ দেওয়া হল মন্দিরে। বেনেদের মেয়েরা সারাদিন থাকল ঠাকুরকে নিয়ে।

পরের দিন শনিবার। কত মানুষজন এল মন্দিরে। ধরতে পারলাম না ঠাকুরকে। রবিবারও হল না।

আজ সোমবার। আমার থাকার মেয়াদ আজ শেষ। ঘুম থেকে উঠে সোজা ঠাকুরের ঘরে। দেখি, ঠাকুর বেরিয়ে যাচ্ছেন। উঠানে পা দেবার আগেই ডান হাত ধরে টান দিলাম ঠাকুরের। পিছন ফিরে বললেন,-'ঘরে বস্। আমি এখনই আসছি।'

ঘরে আর ঢুকলাম না বাবা। বসে থাকলাম দক্ষিণের বারান্দায়। দেখছি, ঠাকুর গেলেন চাঁদনীর দিকে।

ফিরলেন, বেশ অনেকক্ষণ পরে। ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক কি যেন খুঁজলেন। তারপর বাইরে এসে একটা কাঠের পিঁড়ি নিয়ে গেলেন ভিতরে।

খোলা দরজা দিয়ে দেখছি আমি। ঠাকুর বসলেন পিঁড়ি পেতে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি আমি ঠাকুরের দিকে।

দেখছি, দেখছি বাবা···। ধীরে ধীরে আলোয় ভরে গেল ঘরটা। সে কী আলোর ছটা। যেন হাজার সূর্য উঠেছে। অথচ মজা দেখ, কোন তাপ নেই সে আলোতে। আর কি মধুর গন্ধ। চারিদিক ভরে উঠল সেই সুগন্ধে। তারপর, সেই আলো ঘর ছেড়ে ছড়িয়ে পড়ল বাইরের দিকে। ছড়িয়ে পড়ল গঙ্গার বুকে সেই আলোর বন্যা। জল আর দেখতে পাচ্ছি না। শুধু আলো আর আলো।

এদিকে আমি যেখানে বসেছিলাম সেখানেও আসছে আলোর স্রোত হুহু করে। আমি ত প্রায় ডুবে গেলাম আলোর তরঙ্গে।

কোনো রকমে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে গেলাম ঠাকুরের দিকে। কেবলই বলছি, 'তুমি ত ঠাকুর। বলনাগো তুমি কি ঠাকুর? ও ঠাকুর বলনাগো তুমি কি ঠাকুর?'

আন্দাজে হাজির হলাম ঠাকুরের কাছে। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। এবার ঝপ্ করে পড়ে গেলাম ঠাকুরের গায়ে। তারপর আর জানিনে···।

যখন জ্ঞান এল, দেখি শুয়ে আছি ঠাকুরের কোলে। গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ঠাকুর। শরীরে একদম সাড় নেই।

অনেকক্ষণ পরে গায়ে-হাতে বল পেলাম। ফিরে এলাম ন'বতে।

এতখানি বেলা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া হয় নি। গাঁদাফুল-দিদির কি রাগ! বললেন, 'সারাদিন কোথায় ছিলি ভবতারিণী। দু'দণ্ড থাকবি না ঘরে! দু'টা কথা বলব তারও জো নেই। কেবল খেলা আর খেলা। দু'মুঠা খাবারও সময় পাস নে।'

দাদার গা থেকে কেমন আলো বেরিয়েছিল, বললাম গাঁদাফুল-দিদিকে। শুনে, কেমন আনমনা হয়ে গেলেন দিদি। বললেন, 'ভবতারিণী, তোরা নিতুই নিতুই দেখবি রে। তোরা পিঠোপিঠি দেখবি··· ।'

ঠাকুর মা ওঁরা ত রাঢ় দেশের লোক। যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলতেন, ওই রকম ভাষায় নিতুই নিতুই। আর আমাদের সঙ্গে যখন বলতেন, আমাদের মতন।

তারপর আমাকে খেতে দিলেন। খাবার খেয়েই ছুট। একেবারে খেলুড়েদের ঘরে।

ঠাকুর বার বার বারণ করেছিলেন, 'ভবতারিণী, কারুর কাছে বলবি না এসব কথা— ।'

তখন ত সায় দিয়েছি। সে কি আর খেয়াল আছে? দেখা হতেই দু'বোনকে বললাম, 'জানিস ভাই, আজ আবার দাদার গা থেকে আলো বেরিয়েছে। সে কী সোনা সোনা আলো রে! সারা ঘর ভরে গেল সে আলোতে। তারপর, দরজা দিয়ে ছুটতে লাগল সেই আলোর স্রোত গঙ্গার দিকে। বাইরে বসে ছিলাম আমি। আমিও ডুবে গেলাম ওই আলোর মধ্যে।'

হাঁ করে দু'বোনে শুনছে। বুঝতে পারছে না, কি আলো আলো বলছি। ওদের মধ্যে সুখদা বড়। আমার হাতদু'টি ধরে সে বলল, 'ভবতারিণী, আমাদের একদিন দেখাবি ভাই; তোর দাদার গা দিয়ে কেমন আলো বেরোয়।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলাম আমি। আর তখনই মনে পড়ে গেল দাদার কথা—'ভবতারিণী এসব কথা কারও কাছে বলবি না।'

একহাত জিভ কেটে ফেলেছি। কি আর করি, ওদের দু'বোনকে বললাম, 'দেখ ভাই, দাদাকে বলব তোদের কথা। তবে, দিব্য কেটে বল—একথা কারুর কাছে বলবি না।'

দু'বোনেই বলল একসঙ্গে, 'বলব না, বলব না, বলব না।'

মনটা হালকা হল। ফিরে এলাম ন'বতে।

পরের দিন সকালে গেছি দাদার ঘরে। ওমা, দেখি বর আসছে সাত-সকালে ঠাকুরের কাছে। তাড়াতাড়ি একগলা ঘোমটা টেনে দিলাম।

ঠাকুরের পায়ে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল আমার বর। তারপর, অভিমান ভরে বলল ঠাকুরকে, 'বাবা, আমরা আপনার সন্তান। সব সময় যাতায়াত করছি আপনার কাছে। আমরা কিছুই পাব না। আর, ভবতারিণী কি ভাগ্য নিয়েই জন্মেছে। তার উপর আপনার যত কৃপা।'

কথাটা শুনেই বুঝে নিলাম। এ নিশ্চয়ই সুখদার কাজ। দেখা হতেই বলে দিয়েছে আমার বরকে। ভাবলাম, দাঁড়া···যাই একবার, মজা দেখাচ্ছি।

বরের কথা শুনে ঠাকুর মুচকি মুচকি হাসছেন। আর, আমার পিঠে হাত বোলাচ্ছেন। হঠাৎ কি খেয়াল চাপল ঠাকুরের। বরকে বললেন, 'তোরা ত আমার কাছে অনেক পেয়েছিস। ভবতারিণী এখন বড় হয়ে উঠছে। কিছু কিছু তাকে দে··· ।'

যেই না বলা—ওরা অনেক পেয়েছে! ক্ষেপীর ঘোমটা উড়ে গেল এক নিমেষে। চোখ পাকিয়ে ঠাকুরকে বললাম, 'কেন? ও আমাকে দেবে কেন? ওকে অনেক দিয়েছ—আমাকে কিছু কিছু কেন? আমাকে অনেক দাও?'

ঠাকুর যেন শুনতে পেলেন না আমার কথা। বরকে আবার বললেন, 'তোরা ত অনেক পেয়েছিস। কিছু কিছু দে ভবতারিণীকে।'

বলব কি বাবা, রাগে জ্ঞানহারা হয়ে গেলাম আমি। ঠাকুরের গা ধরে নাড়া দিচ্ছি আমি, আর বলছি, 'ও কেন আমাকে দেবে? কিছু কিছু আমি নেব কেন? দাও, তুমি আমাকে অনেক দাও।'

বলছি আর নাড়া দিচ্ছি ঠাকুরকে। বয়ে গেছে ঠাকুরের আমার কথার জবাব দিতে। তিনি আবার বললেন আমার বরকে—তোরা ত অনেক পেয়েছিস্ উপেন। ভবতারিণী এখন বড় হয়ে উঠছে। ওকে কিছু কিছু…'

বাকী কথাটা আর শেষ করতে দিলাম না বাবা ঠাকুরকে। ধেই ধেই করে নাচছি আর ধাক্কা দিচ্ছি ঠাকুরকে। চেঁচিয়ে উঠলাম, 'নেবনা-নেবনা-নেব-না। ওকে অনেক দিয়েছ; আমাকে অ-নে-ক দাও।'

রাগ না চণ্ডাল। এতক্ষণ মুখ চলছিল, এবার বাবা, হাতও চলতে লাগল। ভাবতে গেলে গায়ে এখনও কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ঠাকুর বাঁ হাতে আমাকে ধরে রেখেছেন। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠেছে আমার বরের মুখ। ওই অবস্থায় উবু হয়ে পা ঘষে-ঘষে ঠাকুর এগিয়ে গেলেন তাঁর ছোট খাটটির দিকে। ডান হাত বাড়িয়ে টেনে আনলেন একটা মাটির হাঁড়ি। সরাটা নামিয়ে রেখে বললেন, 'নিবি ভবতারিণী, হাত পাত।'

আমি বাবা ভাবছি, গয়না-গাঁটি কিছু একটা হবে। ওমা! মুঠো করে তুলে নিলেন ঠাকুর, রুদ্রাক্ষের একছড়া মালা। আমার হাত ছু'টো জড় করে সেই মালাছড়াটা জড়িয়ে দিলেন আমার হাতে।

কোথায় পাব সোনার হার…তা না দিয়ে রুদ্রাক্ষের মালা! বড় ঘা লাগল মনে। ছুঁড়ে মারলাম সেই মালা ঠাকুরকে। চেঁচিয়ে

উঠলাম, 'শালার বেটা শালা, আমার বেলায় কাঠের মালা। নেবনা, নেবনা আমি।'

ঠাকুর তখনও হাসছেন মুচিক মুচকি। কুড়িয়ে নিলেন মালা-ছড়াটা। জোর করে বসালেন আমাকে তাঁর কোলের উপর। বললেন, 'ভবতারিণী, মন্তর নিতে চেয়েছিলি—। আয় তোকে মন্তর দিই।'

কি জানি বাবা, আমি যেন কেমন ঠাণ্ডা পাথর হয়ে গেলাম। মন্তর শোনালেন। কেমন করে মালা ধরতে হয়, কেমন ঘোরাতে হয় বার বার, দেখিয়ে দিলেন।

ভয় ভয় করছে। বললাম, যদি ভুলে যাই মন্তর ?

বরকে দেখিয়ে ঠাকুর বললেন, 'যদি ভুলে যাস্। উপেন তোকে বলে দেবে।'

বসুমতী-মা আবেগভরে করে যাচ্ছিলেন তাঁর পুরনো স্মৃতির রোমন্থন। আমরা স্বামী স্ত্রী দু'জনে অবাক বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছিলাম তাঁর মধুর কথা। এবার হঠাৎ চোখে পড়ল আমার, বসুমতী-মার গলার দিকে। দেখি, ঠাকুরের দেওয়া সেই রুদ্রাক্ষের মালা। ইসারা করে দেখালাম স্বামীকে।

ছেলেমানুষের মতো আবদার ধরলেন স্বামী, 'মা, মালাটা একবার ছুঁইয়ে দিন না আমার মাথায়···।'

স্বর্গীয় সুষমায় ভরে উঠল মার প্রশান্ত আনন। আনমনে বলে উঠলেন মা, 'জল পেলে, তৃষ্ণা কি আর থাকে বাবা···।'

ব্যথাক্লিষ্ট অন্তরে তাকিয়ে আছেন আমার স্বামী। আশাহত বেদনার ছোঁয়া বোধ হয় লাগল মার মনে।

তাই সান্ত্বনার ছলে মা বললেন আমার স্বামীকে, 'মন প্রাণ দিয়ে ডাক বাবা ঠাকুরকে। অন্তর্যামী নারায়ণ। তোমার মনোবাসনা নিশ্চয়ই পূরণ করবেন।'

মা আবার ভাবস্থ হলেন।···কিছুক্ষণ বাদে হুঁশ এল। বলতে শুরু করলেন :

তিনি কি শুধু আমাকেই কৃপা করেছেন। জীবের উদ্ধারের জন্যই তাঁর দেহধারণ। কল্পতরু হয়ে তিনি কি দিয়ে গেলেন, দেখলে না বাবা ? গলায় অত বড় ঘা। কিছু খাওয়ার ক্ষমতা নেই। শরীর শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে। পাশ ফিরতে কষ্ট হয়—সেই মানুষ, ভাবের ঘোরে উঠলেন বিছানা ছেড়ে। এক-পা এক-পা করে নামছেন সিঁড়ি ভেঙে। মুখে বলছেন, 'জগতের চৈতন্য হোক। জগতের চৈতন্য হোক।'

বাবা, কথাটা তলিয়ে দেখ। নরেনের নয়, রাখালের নয়, তারকের নয়, যোগিনের নয়—যে সব ছেলেরা মরণপণ করে গুরুসেবা করছে তাদের কারুর নাম নিলেন না। বললেন—জগতের চৈতন্য হোক।

সে-জগৎ তখনকার তারা, সে-জগৎ এখনকার এরা। আর তারই কথা শুনবে বলে।···

গলার রোগ! ও ত রটনা। রোগ না ছল। ওই রোগের ভান করে ভিড় কাটিয়ে ছেলেদের জড় করলেন নিজের কাছটিতে। মাতিয়ে দিলেন তাদের ধ্যানে-জপে।

পালা করে দু'জন থাকে তাঁর সেবায়। আর বাকী সব ছেলের দল, রাতের অন্ধকারে ডুবে যায় গভীর ধ্যানে।

বিধাতাপুরুষ শুয়ে থাকেন দোতলায়, কিন্তু নজর তাঁর সর্বত্র। নরেনদা যেদিন ধ্যানের ঝোঁকে ছুঁতে বলল কালীকে, ঠাকুরের সে কী বকুনি!

'একটু জমা না হতেই খরচ! দিলি ত ওর ভাব নষ্ট করে—।'

লজ্জায় মুখ নীচু করে রইল নরেনদা।

জান বাবা, অত বড় অসুখে সোনার বরণ কালো হয়ে গেছে, কিন্তু, মুখের জ্যোতি অমলিন। খাবার খেলে নেমে আসে গলা দিয়ে—এত বড় ঘা। অথচ কথা বলার কামাই নেই। যার যা মনের সন্দ মিটিয়ে নিয়ে ফিরে যায়। ভক্ত ছেলেদের বাড়ির মেয়েরাও আসে ঠাকুরকে দেখতে।

দুধের সর খাবার ইচ্ছা হয়েছে ঠাকুরের। একটি বউ নিয়ে এল একদিন। সর শক্ত। ঠাকুর খেতে পারলেন না।

বাড়ি ফিরে শাশুড়ীকে বললাম। শোনামাত্র ননদ-ভাজ বসে গেলেন সর তুলতে। পরের দিন একবাটি সর আঁচল চাপা দিয়ে নিয়ে গেলাম ঠাকুরের কাছে।

পলতে দিয়ে যেমন করে দুধ খাওয়ায় পাখির ছানাকে, ঠিক সেইভাবে আঙুলের ডগা সরে ডুবিয়ে ঠাকুরের মুখে ধরছি। আর, তিনি জিভ দিয়ে গ্রহণ করছেন। স-বটুকু খাওয়ালাম বাবা।

খেলেন ত। কেমন লাগল তাত বললেন না। লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেললাম, 'কেমন লাগল ?'

মুচকি হেসে ঠাকুর বললেন, 'পাকা-গিন্নী, ভাল লাগল রে। বেশ নরম।'

মনটা আমার ভরে উঠল কানায় কানায়। বাড়ি ফিরে গিয়েই শাশুড়ীকে সব বললাম। ঠাকুর খেয়েছেন! ওঁদের আনন্দ আর ধরে না।

যাবার দিন এগিয়ে আসছে ঠাকুরের। যে সব ছেলেরা বাড়ি থেকে যাতায়াত করছিল তারাও আটকে পড়ল কাশীপুরে। মাঝে-মধ্যে বাড়ি আসত আমার বর। আর আসে না। ঘর-বার করছেন শাশুড়ী, ছেলের কাছে খবর পাবেন ঠাকুরের।

ছেলে এল পরের দিন সকালে। চুল উস্ক-খুস্ক ; চোখ দুটো

রাঙা করমচা। রাজ্যের ছেঁড়াকাপড় থাকে যে প্যাঁটরায়, সেইটা টেনে বার করল আমার বর। একগাদা কাপড় দলা পাকিয়ে পুঁটলি বাঁধছে আমার বর, শাশুড়ী ঢুকলেন ঘরে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ছেলেকে, 'হ্যাঁরে, মারা গেছেন ঠাকুর?'

গর্জে উঠল আমার বর। বলল, 'কাকে কি বলতে হয় তাও শেখ নি। একি সাধারণ মানুষ যে চোখ বুঝলেই শেষ! রাত তিনটা থেকে মহাসমাধি। গা এখনও গরম···।

শাশুড়ীর প্রবল ইচ্ছা ছেলের সঙ্গে যাবার। শুনে ছেলে বলল, 'বোঝা বাড়িও না আমার। আমি মরছি নিজের জ্বালায়। ইচ্ছা হয়ত যেও তুপুরের দিকে।'

ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে দৌড় দিল আমার বর। সেকালে রাস্তায় আলো ছিল না বাবা। ওই যে ছেঁড়া কাপড় নিয়ে গেল, মশাল বানিয়ে রেড়ির তেলের আলো জ্বালালে।

তুপুর হতে না হতেই আমায় নিয়ে শাশুড়ী চললেন কাশীপুরে। দিদির ঘরে ঢুকে দেখি, ঘর ভর্তি মেয়ের দল। একপাশে জড়সড় হয়ে বসে থাকলাম। ঠাকুর যে নেই ভাবতেই পারছি না।

ছেলেরা সব দোতলায় ঠাকুরের কাছে। ভীষণ কান্নাকাটি করছে সবাই। একবার দোতলায় আবার একতলায়, ছোটাছুটি করছেন অক্ষয় মাস্টার। আর, ছেলেদের সামলাচ্ছেন।

বিকেলের দিকে নামানো হল ঠাকুরকে নিচের তলায়। প্রণাম করে যাচ্ছে সবাই একের পর এক। শাশুড়ীর সঙ্গে আমিও এলাম।

এর আগে কখনও কারুর মৃত্যু আমি দেখি নি বাবা। মনে হল ঠাকুর ঘুমাচ্ছেন। কিন্তু সবাই কাঁদছে কেন? ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ঠাকুরকে। তারপর, দাদাগো দাদাগো বলে ভেঙে পড়লাম কান্নায়।

কেউ সামলাতে পারছে না আমাকে। শেষে আমার বর এল। ইসারা করল শাশুড়ীকে, দু'জনে টানতে টানতে সরিয়ে নিয়ে গেল।

বাইরে এসে মাকে খুব ধমকে দিল ছেলে। বলল, 'এইজন্যই আনতে চাই নি। ওকে নিয়ে বাড়ি যাও, রাত বাড়ছে।'

সন্ধ্যা উতরে গেছে অনেকক্ষণ। আমাকে নিয়ে শাশুড়ী এলেন বড় রাস্তার ধারে। ভরা বর্ষা। রাস্তা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। গাড়ি ঘোড়া, লোকজন সব ফাঁকা।

শাশুড়ীর মহা ভাবনা, বাড়ি ফেরেন কি করে। যদি একটা গাড়ি পাওয়া যায় এই আশায় তাকিয়ে আছেন রাস্তার দিকে।

হঠাৎ কালোপানা একটি ছেলে, বয়স হবে বিশ কি বাইশ বছর—বেরিয়ে এল বাগান থেকে। শাশুড়ীকে বলল, 'মা, আপনারা ত আহিরিটোলা যাবেন? দাঁড়ান। একটা গাড়ি নিয়ে আসি।'

বোবার মতন তাকিয়ে আছেন শাশুড়ী। বুঝলাম, ছেলেটি হয়ত নতুন এসেছে—তাই শাশুড়ী চিনতে পারছেন না।

খানিক বাদে ছেলেটি এল, একটা পালকি গাড়ি নিয়ে। আমাদের তুলে দিয়ে সে উঠল কোচবাক্সে। শাশুড়ী যত বলেন, 'তোমায় আর যেতে হবে না বাবা। কত কাজ এখানে। নেমে এস তুমি। আমরা ঠিক যেতে পারব···।'

কে কার কথা শোনে। ছেলেটি কিছুতেই নামল না। এদিকে, শাশুড়ীর ভয়, ওর ফেরার গাড়ি ভাড়া দিতে হবে।···বুঝে দেখ বাবা কত গরীব ছিলাম আমরা।

গাড়ি যত এগিয়ে যাচ্ছে শাশুড়ী কেবলই বলে চলেছেন, 'ও বাবা, তুমি নেমে এস বাবা? তোমাকে আর যেতে হবে না। তুমি কেন কষ্ট করে যাবে বাবা। আমরা নিজেরাই যেতে পারব···।'

গাড়ি এল বাগবাজার পুলে। নামল না ছেলেটি। শাশুড়ীর মুখের বিরাম নেই। কেবল একই কথা।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। কই, ছেলেটি ত নেই কোচবাক্সে! গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন শাশুড়ী। পশ্চিমী মুসলমান, অবাক। বলল, 'কই, কেউ ত বসে নি আমার পাশে!'

শাশুড়ী বিশ্বাস করলেন না। বললেন, 'সে কী! যে তোমায় ডেকে আনল?'

কুর্নিশ করে গাড়োয়ান বলল, 'ওযে খুদা আছে মায়ি। খুদা আমায় ডেকে বললেন—ওদের পঁহুছে দিয়ে আয়। ওঃ, সে কী আলোর রোশনি মায়ি! খুদা আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।'

ফিরে গেল গাড়োয়ান। একটি পয়সাও নিল না গাড়িভাড়া। শাশুড়ী কত বললেন, শুনল না। যাবার মুখে বলে গেল, 'বড় মেহের-বান খুদা।'

…ঠাকুর নাকি আগে একদিন ছেলেদের বলেছিলেন, 'দেখ খুব সাধারণভাবে আমাকে নিয়ে যাবি। ·ড় খাট, ফুলের মালা, হরি-নামের দল এসব ভড়ং করবি না। আর পাঁচজন যেমন যায়, তেমনি… ।'

তা কি হয় বাবা। রামদাদা, মনমোহনদাদা, মাস্টারমশাই, গিরিশবাবু এঁরা সব রয়েছেন। গোছগাছ করতে দেরি হয়ে গেল।

ঠিক হল যাদের ব্রাহ্মণ শরীর তারাই কাঁধ দেবে। পায়ের দিকের খাটের একটা পায়া কাঁধে নিল আমার বর।

যাত্রা শুরু হল। বহু লোক জড় হয়েছে। এরা সব থাকে কাছাকাছি বস্তিতে। কেউ হয়ত মুদি, কেউ বা কারখানার কুলি এই সব।

দুপাশে মশাল ধরে দু'জন চলেছে। আগে আছে হরিনামের দল।

বাগান পেরিয়ে তখনও ওরা রাস্তায় নামে নি, হঠাৎ চীৎকার করে উঠল আমার বর, 'আমায় সাপে কেটেছে—'

সাপে কেটেছে, যেই না শোনা বলব কি বাবা, অত ভিড় এক পলকে ফাঁকা হয়ে গেল। যে যেদিকে পারল, দৌড় আর দৌড়।

এদিকে আমার বর এক ঝটকায় ছুঁড়ে দিল পা-টা। ছিটকে পড়ল কাল সাপ পা থেকে। সামনে ছিল একটা বাবলা গাছ, ধাক্কা খেয়ে সাপটা মাটিতে পড়ল।

দাঁড়িয়ে গেল ছেলেরা। আমার বরকে সরিয়ে নেবে। এমন সময় দৈববাণী শুনল আমার বর। ঠাকুর বলছেন, 'ভয় পাস নি উপেন। সাপের বিষে তুই মরবি না। আজ থেকে তোর দুঃসময় কাটল। দেব দ্বিজে ভক্তি রাখবি। দুঃখীর দুঃখ নিজের বলে মনে করবি। লোকের বিপদে পাশে গিয়ে দাঁড়াবি। আমার কাছে এতদিন যা শুনেছিস সেইভাবে নিজেকে তৈরি কর।'

কানখাড়া করে শুনল আমার বর। এদিকে ওর গুরুভায়েরা হাত ধরে টানছে। সরিয়ে নেবে খাট থেকে। বাঁ'হাত তুলে ইসারা করল আমার বর। ঠাকুরের শেষ আদেশ হৃদয়ে গেঁথে রাখছে সে।

শক্ত করে ধরে আছে খাটের পায়া। ছেলেরা আর কি করে? যার যার গলায় পৈতা ছিল খুলে দিল। টানটান করে তাগা বাঁধা হল বরের পায়ে, আট দশটা—হাঁটু পর্যন্ত। আর, ওই পা নিয়ে সমান তালে হেঁটে গেল আমার বর শ্মশান পর্যন্ত।

তখনকার দিনে কাশীপুর শ্মশানঘাটের অবস্থা আর বলার নয়। খানাখন্দ ঝোপজঙ্গলে ভর্তি। আলোর ব্যবস্থা তখনও হয় নি। দিনের বেলা এরা গিয়ে সাফ্-সুফ করে এসেছে। মশালের আলোতে রাঙা হয়ে উঠল শ্মশানঘাট।

খাট নামিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল ছেলেরা। সামলাবার কেউ

নেই। অক্ষয় মাস্টার একা চরকির মতো ঘুরছে। কুয়ো খোঁড়া, চিতা সাজানো সবই দেখতে হচ্ছে অক্ষয় মাস্টারকে।

প্রচুর পাটকাঠি এসেছে। প্রত্যেক ছেলের জন্য এক এক বাণ্ডিল। মুখাগ্নি করবেন রাখাল মহারাজ। কিন্তু তুলে দাঁড় করানো যাচ্ছে না। রাখাল মহারাজ কান্নায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন মাটিতে।

রাখাল মহারাজকে কোনো রকমে ঘোরানো হল চিতার চারপাশে। তারপর, যেই মুখাগ্নি করানো হবে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন রাখাল মহারাজ মাটিতে। ওই অবস্থায়, অক্ষয় মাস্টার গুঁজে দিল পাটকাঠির জ্বলন্ত বাণ্ডিলটা রাখাল মহারাজের হাতে। আর সেই হাতখানা নিজে ধরে ছুঁইয়ে দিল ঠাকুরের মুখে।

দিব্য দেহের স্পর্শ পাবার জন্য অগ্নিদেব যেন তৈরি হয়েছিলেন। মুহূর্ত মধ্যে আগুনের লেলিহান শিখা ঊর্ধ্ব হতে ঊর্ধ্বগামী হয়ে উঠল। এমন ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে যে আশে পাশে কেউ দাঁড়াতে পারল না।

পঞ্চভূতের দেহ মিশে গেল আকাশে বাতাসে। পড়ে থাকল কয়েক খণ্ড অস্থি ও ভস্ম।

তাই ভরা হল একটা মাটির কলসীতে। তুলে দিল আমার বরের মাথায়। শূন্য হৃদয়ে ছেলেরা ফিরে এল কাশীপুর বাগানে।

ভোরবেলা ওরা ক'জনে আমার বরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গেটের কাছাকাছি এসে থমকে পড়ল ওরা। দেখল···বিরাট লম্বা এক সাপের খোলস। মাথার চক্রটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সরে গেছে সাপটা কিন্তু চিহ্ন রেখে গেছে তার।

বাসিপাট সারছেন শাশুড়ী। বরকে নিয়ে ওঁরা ঢুকলেন। গঙ্গাধর মহারাজ শাশুড়ীকে ডেকে বললেন, 'কাল রাত্রে উপেনকে

সাপে কেটেছে, মা। ভয় পাবার কিছু নেই। তবে বিপদ এখনও কাটে নি। দেখবেন মা, ও যেন আজ কিছু না খায়। আর শুতে দেবেন না যেন—।'

সাপে কেটেছে যেই না শোনা···শাশুড়ীর ত মূর্ছা যাবার অবস্থা। একমাত্র ছেলে। মরা মানুষের মতন সাদা হয়ে উঠল শাশুড়ীর মুখখানা।

গঙ্গাধর মহারাজ সাহস দিয়ে শাশুড়ীকে বললেন, 'ভয় পাচ্ছেন কেন? বিষটা উপরে উঠতে পারে নি। শক্ত করে বাঁধন দেওয়া আছে।'

বাইরের ঘরে বসে গঙ্গাধর মহারাজ শাশুড়ীকে শোনাল কালকের সব কথা। বেলা বাড়ছে। ওদের ফেরার নামটি নেই। শাশুড়ী তাড়া দিচ্ছেন ওদের—'তোমরা যে যার বাড়ি যাও বাবা। কাল দিন-রাত কিভাবে কেটেছে তোমাদের। মুখে জলটুকুও পড়ে নি। আর দেরি ক'র না বাবা। বাড়ি যাও।'

মুখে বলছে যাচ্ছি কিন্তু উঠবার ইচ্ছা কারুর নেই। ঠাকুরের কথায় মেতে আছে ওরা। আর শাশুড়ীর কেবল তাগিদ···।

অনেকটা বেলায় ওরা উঠল। যাবার সময় আবার বলে গেল শাশুড়ীকে, 'নজর রাখবেন মা। কিছুতেই খেতে দেবেন না। আর সারাক্ষণ জাগিয়ে রাখবেন।'

বাড়ির চৌকাঠ যেই ওরা পেরিয়েছে, গলা ফাটিয়ে শাশুড়ীর সে কি চীৎকার—কি সর্বনাশ হল গো। উপেনকে আমার সাপে কামড়েছে গো। তাকে কেমন করে আমি বাঁচাব গো···।

পাড়াসুদ্ধ লোক ঝেঁটিয়ে এল আমাদের বাড়ি। তখনকার দিনে এত ডাক্তারের ছড়াছড়ি ছিল না বাবা। যা করে রোজার ঝাড়ফুঁক। সাপে কাটলে ফিরত খুব কম লোক।

যে যেদিকে পারল ছুটল রোজার খোঁজে। বৌ, ঝি, ছেলেমেয়ে গিজগিজ করছে সারা উঠান।

ঘরের মধ্যে বসে ছিলাম আমি। বর ঘরে ঢুকে আমাকে বলল, 'ভবি, একটা কাঁচি আনতে পারিস ?'

কাঁচি কেমন জিনিস কখনও চোখে দেখি নি। আমাদের কালে সেলাই ফোঁড় ছিল না বাবা। বললাম, 'সে আবার কি ?'

দু'টো আঙুলে কাটার ভঙ্গি করে বোঝাতে লাগল আমার বর। যে জিনিস কখনও চোখে দেখি নি, আঙুল নাড়লে হবে কি ? আমি বললাম, 'জাঁতি চাইছ ?'

কথাটা মনে ধরল আমার বরের। শাশুড়ীর ঘর থেকে জাঁতিটা এনে দিলাম। তক্তপোশের উপর ডান পাটা তুলে বাঁধনগুলো কটকট্ করে কেটে ফেলল। তারপর চুপিচুপি আমায় জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে ভবি, খাবার-দাবার কিছু আছে ?'

আগের দিন নারায়ণের ভোগ দেওয়া হয়েছিল। তালের বড়া, সরু-চাকলি, পুলিপিঠে, সুজির পায়েস—থরে থরে সব সাজানো, তক্তপোশের তলায়। দেখিয়ে দিলাম আমার বরকে।

যেই না দেখা—হন্যে হয়ে উঠল আমার বর। বলল, 'বড় দেখে এক ঘটি জল নিয়ে আয়।'

জল নিয়ে যেই না ঢুকেছি, কেড়ে নিল ঘটিটা আমার হাত থেকে। তারপর, আমাকে ঠেলে বার করে দিয়ে খিল দিল ঘরে।

হাঁসহাঁস করে খাচ্ছে, যেন কতজন্ম কিছু খায় নি। ঘটির জলটাও শেষ করল। তারপর, চুপিসাড়ে জানলা বন্ধ করে লম্বা ঘুম।

আমি আর কোথায় যাব। আমার ঘরের পাশে দোতলায় উঠার সিঁড়ি। বসে থাকলাম সিঁড়ির মাঝামাঝি।

...রোজা নিয়ে মামাশ্বশুর ফিরলেন। সবাই খুঁজছে আমার

বরকে। কোথাও পেল না। শাশুড়ী এলেন। বললেন, 'উপেন কোথায় বৌমা ?'

আমি বললাম, 'ওই ত খিল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। আমাকে বলল, জাঁতি নিয়ে আয়। পায়ের বাঁধন কাটল। বলল, খাবার আছে ? দেখিয়ে দিলাম। এক ঘটি জল চাইল—এনে দিলাম। শেষে আমায় বার করে দিয়ে, খাবার জল সব খেল। এখন, বিছানায় লম্বা হয়ে নাক ডাকাচ্ছে।'

ব্যাস্ আর যায় কোথা। কপাল চাপড়ে, চুল ছিঁড়ে সে কী গালাগাল বাবা। আগুন ঝরতে লাগল শাশুড়ীর মুখ দিয়ে।

'কি ছোটলোকের ঘর থেকে মেয়ে এনেছি গো। আমার সোনার চাঁদ ছেলেটাকে খেয়ে ফেলল গো। কি রাক্ষসী এসেছে গো আমার ঘরে—।'

ঢেউ তুলে কাঁদছেন আর শাপ-শাপান্ত করছেন আমাকে। কাঁহাতক সহ্য করি। আমার রক্তও চড়ে গেল মাথায়। বললাম, 'হারামজাদী, আমি তোর ছেলে খেয়েছি ? তোর ছেলেকে ত সাপে কেটেছে। আমাকে গালাগাল দিচ্ছিস কেন ?'

আমার কথা আর কে শোনে বাবা। সবাই ব্যস্ত ছেলের জন্য। ডাকাডাকি, সাধ্য-সাধনা, ছেলে আর ওঠে না। এদিকে বেলা গড়িয়ে গেল।

ওরা ধরে নিল, ছেলে আর বেঁচে নেই। দরজা ভেঙে লাশ বার করতে হবে। দুমদাম ধাক্কা দিতে লাগল।

এমন সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এল আমার বর। ওকে দেখে হৈ হৈ করে উঠল সবাই।

কাউকে কিছু না বলে, আমাকে পাশ কাটিয়ে উঠে গেল আমার বর দোতলার ছাদে। আর, আমাকে নিয়ে লোফালুফি শুরু করল

রাজ্যের মেয়ের দল। কোথায় ছিলেন শাশুড়ী বুকে জড়িয়ে সে কী আদরের ঘটা!

'এ যে আমার বেহুলা বৌ গো! কি পয়মন্ত মেয়েরে—মরা ছেলেকে আমার, টেনে আনল যমের মুখ থেকে!! ওরে আমার রাজরানী রে—।'

ব্যাস্ যেই না বেহুলা বলা—ও বাবা, সধবা মেয়েরা হুড়োহুড়ি করে এগিয়ে এল। আমার সিঁথি থেকে সিঁদুর নিচ্ছে দেখে রুখে ওঠলেন শাশুড়ী। বললে, 'খবরদার। সিঁথিতে হাত দিও না বৌমার। সিঁদুর এনে ছুঁইয়ে নাও।'

তারপর বাবা, সিঁদুর ছড়িয়ে ছড়িয়ে আমাকে একেবারে মা-শীতলা বানিয়ে দিল। পাথর প্রতিমা হয়ে বসে আছি। না পারি উঠতে আর না পারি নড়তে। অন্ধকার হতে তবে বাড়ি খালি হল।

এদিকে, ছাদে উঠে পায়চারি করছিল আমার বর। হাত দুটো পিছনে মুড়ে কেবল এদিক আর ওদিক। চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে ঠাকুরের জন্য।

হঠাৎ থমকে গেল আমার বর। দেখল···সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছেন ঠাকুর। ঠাকুরের কণ্ঠে তীব্র ভৎর্সনা, 'তোরা কি ভেবেছিস বলত? আমি কি চিরকাল তোদের হয়ে থাকব। ছেলে একটু বড় হলে, কোল থেকে নামিয়ে দেয় মা। নিজের দায়িত্ব নিজে নিতে বইতে হবে। সাধন-ভজনে ডুবে যা। এখন থেকে আমার কাজ তোদেরই করতে হবে। কেঁদে কেঁদে বেড়ালে কি হবে! আমি কি চিরকাল তোদের হয়ে থাকব? আমি জগতের জন্য এসেছিলাম এখন জগতের হয়েই থাকব।'

মিলিয়ে গেলেন ঠাকুর বাতাসে। চোখের সামনে ঠাকুর নেই,

চমক ভাঙল আমার বরের। হুড়-হুড় করে নেমে এল নিচে। ঘরের মধ্যে ছিল উড়নি, কাঁধে ফেলে একেবারে বড় রাস্তায়।

খানিকটা এগিয়ে দেখে, গঙ্গাধর মহারাজ আসছেন আমাদের বাড়ির দিকে। আমার বরকে দেখে মেজাজ বিগড়ে গেল গঙ্গাধর মহারাজের। বললেন, 'বার বার তোকে বলে এলাম, উপেন, বাড়ির বার হ'বি না। ফের বেরিয়েছিস? আক্কেল-বুদ্ধি ম'লেও হবে না তোর।'

থমকে দাঁড়িয়ে গেল আমার বর। তারপর, সেইখানে দাঁড়িয়ে দুপুর থেকে যা যা ঘটেছে সব শোনাল গঙ্গাধর মহারাজকে। মায়, ঠাকুরের ভর্ৎসনা···। শেষে দু'জনে গেলেন গিরিশবাবুর বাড়ি।

সেখানেও একচোট বকুনি। গিরিশবাবুও সব শুনলেন। ওখান থেকে ওরা দু'ভায়ে গেলেন বলরামবাবুর বাড়ি। কাউকে না পেয়ে এলেন কাশীপুর বাগানে। মাথামুড়ি চাপা দিয়ে পড়ে আছেন লাটুভাই। আর কেউ নেই।

হঠাৎ গঙ্গাধর মহারাজের খেয়াল চাপল দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার। সেখানে গিয়ে দেখেন, নরেনদা ও রাখাল মহারাজ দু'জনে বসে, গঙ্গার ধারে।

দূর থেকে দেখলেন ওঁরা। আমার বরকে নিয়ে গঙ্গাধর মহারাজ এগিয়ে যাচ্ছেন ওঁদের দিকে।

রাগলে নরেনদাদার জ্ঞান থাকত না। যাচ্ছেতাই করে বকলেন গঙ্গাধর মহারাজকে। শেষে বললেন, 'উপেনটাকে না মেরে তোরা ছাড়বি না।'

কাঁদতে কাঁদতে আমার বর বলল, 'দাদা, ঠাকুর এসেছিলেন সন্ধ্যাবেলা। বলে গেলেন···'

রাগ উড়ে গেল নরেনদাদার এক মুহূর্তে ঠাকুরের নাম শুনে। বললেন, রাজাকে আর আমাকে, দু'জনকেই বলে গেলেন—ওই একই কথা।

চাপা কান্নায় গলা বন্ধ হয়ে গেল নরেনদাদার···আমি এখন থেকে জগতের হয়েই থাকব···

উত্তর খণ্ড

···শেষ করলেন বসুমতী-মা। সামনে বসে আছি আমরা দু'জনে। চোখের উপর যেন ছবিটা ভাসছে।···রাজা মহারাজ, স্বামীজী, গঙ্গাধর মহারাজ আর উপেনবাবু। সদ্য পিতৃহারা অনাথ চারটি ভাই—শোকে দুঃখে মুহ্যমান।

বাহ্যজগতে মায়ের মনকে নামিয়ে আনার জন্য আমার স্বামী প্রশ্ন করলেন বসুমতী-মাকে, 'হ্যাঁ মা, আপনার স্বামী ঠাকুরকে প্রথম দেখেন কবে?'

অল্পক্ষণ চিন্তা করে মা বললেন:

সে কি আজকের কথা বাবা! শাশুড়ীর মুখে শুনেছি, ছোটবেলায় ওঁরা ক'জন দল বেঁধে যেত দক্ষিণেশ্বরে। গরীবের ঘরের ছেলে ছিল আমার বর। বাপ ছিল কুলীন—ফুলে মুখোটি। বিয়ে করেছিলেন অনেক। আমার শাশুড়ী পড়ে থাকতেন ছেলে নিয়ে ভাই-এর ঘরে। বরাত জোর, মামার ছেলেপুলে নেই। তাই, কষ্টেসৃষ্টে মানুষ করলেন ছেলেকে মা মামী দু'জনেই।

কেশব সেনের দৌলতে তখন ঠাকুরের নাম কলকাতার বাবুদের মুখে মুখে। কত সব লোক যেত ঠাকুরের কাছে দক্ষিণেশ্বরে। কেউ যেত দেখতে রানী রাসমণির কালীবাড়ি। কেউ বা বেড়াত পোস্তার ধারে। আবার কেউ বা বসত পঞ্চবটীতলায় বা বেলতলায়—যে দিকে ছিল কোম্পানীর বারুদখানা।

আবার মনের মতো না হলে, ঠাকুর, কাউকে আবার নিজেই সরিয়ে দিতেন।

'যাওনা গো, দেখে এস কেমন রাগান করেছে রানী রাসমণি।'

আমার বর কোথাও যেত না। শুধু দাঁড়িয়ে থাকত ঘরের

বাইরে। মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই, সে কি চায়। শুধু তার নীরব প্রার্থনা। কেবল মানসপূজা।

রাজার রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ। রানী রাসমণির কালীবাড়ির ছোট ভটচায। রানীর জামাই মথুরবাবু ডাকতেন বাবা বলে। ওই একটিমাত্র লোক যিনি চাপরাশ পেয়েছিলেন বাবা বলার। আর কেউ বাবা বলে ডাকলে বিরক্ত হতেন ঠাকুর।

কিন্তু কেন ?

মথুর যে দেখেছিলেন তাঁর সাদা চোখে, তাঁর ইষ্টমূর্তি। না না চোখের ভুল নয়। সত্যদর্শন! দেবদর্শন !!

ঠাকুর স্বমুখে একথা বলেছেন তাঁর সন্তানদের, 'একদিন মথুর বসেছিল কুঠিঘরে—বিষয় চিন্তা করছে। কি জানি বাপু, আমি গোঁভরে চলে বেড়াচ্ছি উত্তরদিকের বারান্দায়। হঠাৎ দৌড়ে এসে পাদুটো জড়িয়ে মথুরের সে কি কান্না। বলে—বাবা তুমি বেড়াচ্ছ, আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখছি তুমি নও—আমার ঐ মন্দিরের মা। আর যেই পিছন ফিরে ওদিকে যাচ্ছ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব। প্রথমে ভাবলুম চোখের ভ্রম হয়েছে ; চোখ ভাল করে মুছে ফের দেখলুম তাই। এইরূপ যতবার করলুম দেখলুম তাই।'

মথুরের ঠিকুজীতে কিন্তু লেখা ছিল বাপু, তার ইষ্টের তার উপর এতটা কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে, শরীর ধারণ করে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, রক্ষা করবে।

রানী রাসমণির জামাই মথুরানাথ বিশ্বাস। তাঁর বাবা কালীঘরের ছোট ভটচায শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

আর, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে কে ? উপেন মুখুয্যে। মামার ভাতে মানুষ যে ছেলেটা। এখন তো একডাকে সকলেই চিনবে।

···বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু তখন ?

ভিতরে তখন গান চলছে।

কে গাইছে অমন দরাজ গলায় তানপুরা হাতে ?

কে যেন বলে উঠল—আরে ওকে চেন না ! ও যে বিলে, সিমলার অ্যাটর্নী বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো নরেন।

নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে আমার বর গায়কের দিকে। আহা, যেমন ভুবন ভোলানো রূপ, তেমনই দেবদুর্লভ কণ্ঠ ! ঠাকুর বসে আছেন ছোট ঘরটিতে, সমাধিস্থ। ঘরের মধ্যে যারা, সবাই দুলছে গানের তালে তালে। আর নরেন ! যেন ধ্যানমগ্ন যোগীশ্বর।

গান শেষ হল। নরেনকে নিয়ে ঠাকুর বেরিয়ে গেলেন। রকমারি খাবার তোলা থাকত নরেনের জন্য। ঠাকুর নিজের হাতে খাওয়াতেন নরেনকে।

কি স্নেহ, কি ভালবাসা ঠাকুরের নরেনের উপর। তিলেকের অদর্শন সইতে পারতেন না ঠাকুর। কতদিন বলেছেন, 'অনেক সময় মনে হত বুকের ভিতরটায় কে যেন গামছা নিংড়োবার মতো জোরে মোচড় দিচ্ছে। নিজেকে সামলাতে না পেরে ঝাউতলার দিকে যেয়ে —ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না রে —বলে ডাক ছেড়ে কত কেঁদেছি ··'

এই সেই নরেন। কত বড় লোকের ছেলে। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে জ্ঞানে গরিমায় উজ্জ্বল একটি রত্ন। যুক্তি তর্কে ক্ষুরধার প্রতিভা কিন্তু ঠাকুরের কাছে ও যেন এক শিশু ভোলানাথ।

ভালবাসা। শুধুমাত্র ভালবাসা। মা-বাবার ভালবাসায় হয়তো তারতম্য থাকতে পারে ; কিন্তু ঠাকুরের !

শুনেছি—অনেক, অনেক দিন পরে, সিস্টার নিবেদিতাকে বলেছিলেন নরেন দাদা,

'মার্গট···লোকটিকে আমি ভালবাসতুম, বুঝতে পারছ—তাতেই আটকে পড়েছিলুম। আমার দেখা পবিত্রতম ব্যক্তি তিনি—অনুভব করেছিলুম। আর জানতুম, তিনি আমাকে এত ভালবাসেন, সে ভালবাসার শক্তি আমার বাপ-মায়েরও নেই।'

দলবলের সঙ্গে ফিরে এল আমার বর। কেবলই ভাবছে, আগে যেন কোথাও দেখেছে ঠাকুরকে। কবে···কোথায়? কিছুতেই মনে পড়ছে না। সন্ধ্যা থেকে রাত, একটানা ওই একই চিন্তা। যেন নেশার ঘোরে বুঁদ হয়ে থাকল আমার বর।

আগে করত ওষুধের দোকানে বোতল ধোয়ার চাকরি। কবে ছেড়ে দিয়েছে। গরীবের সংসার। মামা জগবন্ধু বাঁড়ুয্যে সামান্য চাকরি করতেন রাধাবাজারে এক ঘড়ির দোকানে। ভৎর্সনা, গঞ্জনা, আর তিরস্কার। বসে থাকার জ্বালা আর সহ্য হয় না আমার বরের।

বহু ঘোরাঘুরি করে আর একটা কাজ পেল সে, বটতলার বৃন্দাবন বসাকের বইয়ের দোকানে। মাহিনা মাসে পাঁচটাকা। যতটুকু দুঃখ ঘোচে।

ভোরবেলা আমার বর যায় দোকানে খুলতে। ঝাঁট দিয়ে বই সাজিয়ে বসে থাকে খদ্দেরের আশায়। দোকান খুলে বসে থাকে, কিন্তু মন যে কখন উধাও দক্ষিণেশ্বরে, কিছুই জানে না।

ঠাকুরের মুখখানি তার মনে পড়ছে আর ভাবছে, কোথায়·· কবে—কবে দেখেছি ঠাকুরকে··।

হঠাৎ যেন একটা পরদা সরে গেল। আমার বর দেখল, দুপুর রোদে হেঁটে চলেছেন একটি লোক রাস্তা দিয়ে। রোদের প্রচণ্ড তেজ, অথচ ছাতা বগলে চেপে চলেছেন মানুষটি। কিছুদূর যাবার পর, দেখা গেল—ছাতাটা খসে পড়ল লোকটির বগল থেকে। একি? লোকটির যে খেয়াল নেই। চলেছে তো চ-লেইছে!

তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল আমার বর দোকান থেকে। ছুটল। ছাতাটা কুড়িয়ে ডাক দিল লোকটিকে। তারপর, আরও কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তুলে দিল ছাতাটা সেই মানুষটির হাতে। হাসিমুখে তাকিয়ে থাকলেন সেই পুরুষ।

মনে পড়েছে। অবিকল সেই দৃষ্টি! সেদিনের দেখা সেই পুরুষই—পরমপুরুষ, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির ছোট ভটচায, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

আনন্দে রোমাঞ্চিত হল আমার বর। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর বুকে যেন জোয়ারের ঢল নামল; তাই বুঝি তার চোখে এত জল! ও কি মুছে আর শুকানো যাবে···।

সেদিন কার কাছে যেন শুনল আমার বর, ঠাকুর নাকি আসছেন তাদের পাড়ায়—অধর সেনে" বাড়ি। সেই যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অধর সেন, তাঁদের বাড়িতে। দেবেন মজুমদার, অধর সেন এঁরা সব ঠাকুরের অন্তরঙ্গ।

কথাটা শোনা মাত্র আমার বরের মনটা কেবলই হুহু করতে থাকে। এত কাছে আসছেন ঠাকুর, অথচ সে পাবে না ঠাকুরকে দেখতে। দুষ্ট বুদ্ধি মাথায় চাপল আমার বরের। দুপুরে সেই যে খেতে এল বাড়িতে, দোকানে আর ফিরল না।

দলে ভিড়ে হাজির হল অধর সেনের বাড়ি। দূর থেকে প্রণাম জানাল ঠাকুরকে। কাছে যাবার সাহস নেই।

ঠাকুরের পাশে গা লাগিয়ে বসে ছিলেন রাখালদাদা। কথা বলছিলেন ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে। যত সব রথী-মহারথীরা বসে ছিলেন ঠাকুরের চারপাশে।

দূর থেকে তাকিয়ে থাকল আমার বর ঠাকুরের দিকে। কাঙাল-

নয়নে কেবল বোবা কান্না। অন্তর্যামী নারায়ণ সবই বোঝেন, তবুও নির্বিকার ঠাকুর।

কথাটা কানে উঠল মামার। ভাগ্নে কামাই করেছে এক বেলা। ব্যাস্, রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন তিনি।···কিছুতেই বাগ মানে না ছেলেটা! ঘরে তালা এঁটে রাখলেন ছেলেকে।

···অনেকদিন যাওয়া হয় নি দক্ষিণেশ্বরে। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে আমার বরের ঠাকুরের অদর্শনে। ইতিমধ্যে মামীমার সঙ্গে একটা রফা হয়ে গেছে। মামাকে ফাঁকি দিয়ে একদিন হাজির হল সে দক্ষিণেশ্বরে।

কপাল মন্দ। এত আশা নিয়ে সে এল ঠাকুরকে দেখতে, প্রাণভরে প্রণাম জানাতে—কিছুই হল না। শূন্য মন্দির। ঠাকুর নেই।

কাছে ছিল রামলালদাদা। বলল, 'কিগো, উপেনবাবু এসেছ? ঠাকুর? তিনি যে বেড়াতে গেলেন স্টীমারে, কেশববাবুর সঙ্গে। একটু দেরি করে ফেলেছ, না হলে তুমিও যেতে পারতে। হ্যাগো, কত লোক গেল স্টীমার বোঝাই হয়ে। সঙ্গে আবার একজন পাদ্রী সাহেব। কত গান হবে, নাচ হবে···।'

মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে আমার বরের। কানে কিছুই ঢুকছে না। কত নামডাক কেশববাবুর, তিনি স্টীমার ভাড়া ক'রে বেরিয়েছেন ঠাকুরকে নিয়ে। সেখানে তার স্থান কোথায়!

পাঁচটাকা মাইনেতে বইয়ের দোকানে চাকরি করে। মামার অন্নদাস। খালিপায়ে হেঁটে আসছে সে আহিরিটোলা থেকে দক্ষিণেশ্বরে। সম্বল ধুতির উপর একখানা উড়ুনি।

ভাবে, 'হায় ঠাকুর, দু'পয়সা বাতাসা নিয়ে আসার সামর্থ্য যে আমার নেই। আমি কি করে এসে দাঁড়াব ওদের মাঝখানে।'

বুক ভেসে যাচ্ছে আমার বরের চোখের জলে। রামলালদাদা

দেখল। সান্ত্বনার সুরে বলল, 'কাঁদ কেন ভাই। আবার দেখা পাবে ঠাকুরের সামনের রবিবার। ওহো, তুমি বুঝি জান না—ঠাকুর যাচ্ছেন তোমাদের পাড়ায়। হ্যাঁগো, দেবেনবাবুর বাড়িতে। সারাদিন থাকবেন সেখানে।'

ভগ্নহৃদয়ে ফিরে এল আমার বর। মনকে কেবলই সান্ত্বনা দেয় সে—মাঝে তো আর ক'টা দিন। তারপর আবার দেখা পাবে ঠাকুরের।

আজ রবিবার। অবসান হল শবরীর প্রতীক্ষা। অনেক বলে কয়ে মত আদায় করেছে বৃন্দাবন বসাকের। তাও এক বেলার ছুটি। বেলা একটায় দোকান বন্ধ করল। বটতলা থেকে হেঁটে এল আহিরিটোলায়। রোদে ঘেমে সারা শরীর জব্‌জব্‌ করছে।

গামছা কাঁধে ছুটল গঙ্গায়। হাঁ হাঁ করে তেড়ে এল মামী—

'ওরে, একটু জিরিয়ে নে। ঘামটা শুকুতে দে···'

কে কার কথা নেয়। ঠাকুর এসেছেন সেই সাত সকালে। মন পড়ে আছে তার দেবেনবাবুর বৈঠকখানায়! কত নাচ, কত গান···

নামমাত্র খেতে বসল। তারপর চুপি চুপি মামীমাকে বলে বেরিয়ে পড়ল সে।

দরজাটা ছিল আড়ভেজানো। সামান্য ঠেলাতেই কঁ্যাচ করে উঠল। আমার বর দেখল, ঘর একেবারে ফাঁকা। তাকিয়ায় মাথা দিয়ে শুয়ে আছেন ঠাকুর। পায়ের দিকে বসে আছেন অক্ষয় মাস্টার। ঠাকুরের একখানি পা কোলে তুলে, অক্ষয় মাস্টার হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

বড় অপরাধী মনে হল নিজেকে। চোরের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল আমার বর। ভিতরে যাবার সাহস নেই।

অক্ষয় মাস্টার ঠাকুরকে বললেন, 'উপেন এসেছে।'

তিনি নীরব, নির্বিকার, যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন।

অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকল আমার বর ঠাকুরের দিকে। কি এক রুদ্ধ আবেগে থরথর করে কাঁপতে লাগল তার সারা শরীর। আর চোখ দিয়ে নেমে এল অবিশ্রান্ত ধারায় অভিমানের বন্যা।

একই ভাবে সে দাঁড়িয়ে থাকল দরজার বাইরে। হাতছানি দিয়ে ডাকলেন অক্ষয় মাস্টার। ইসারায় বললেন, ঠাকুরের পায়ে হাত বুলিয়ে দিতে।

হাতে যেন স্বর্গ পেল আমার বর। ভীরু পদক্ষেপে এগিয়ে গেল ঠাকুরের দিকে। অতি সন্তর্পণে তুলে নিল ঠাকুরের দ্বিতীয় চরণখানি নিজের কোলে। তারপর, সেও অক্ষয় মাস্টারের মতো হাত বুলোতে লাগল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-মালিকার দীনতম পুষ্প, আমার বরের হৃদিপদ্ম, পরশমণির ছোঁয়া লেগে যেন শতদল হয়ে ফুটে উঠল। আনন্দের প্রাবল্যে ভেসে গেল তার অভিমানের সব খড়কুটো। দীনহীন কাঙালের ঠাকুর তার। মনোবাসনা পূরণ করলেন সেবার অধিকার দিয়ে।

ততক্ষণে খাওয়া শেষ হয়েছে ছেলেদের। একে একে সবাই নেমে এল দো'তলা থেকে। দেবেনবাবু এলেন সবার শেষে।

তখনও শুয়ে আছেন ঠাকুর। আর, পা-দু'টি কোলে নিয়ে বসে আছে মহাভাগ্যবান দুই ভক্ত অক্ষয় মাস্টার আর আমার বর।

আনন্দে রোমাঞ্চিত হলেন দেবেনবাবু। সুরের দোলায় দুলে উঠল মন।···প্রভু দীন দয়াল দয়া করকে, ভব সাগর পার করো মুঝে···

মিটি মিটি হাসছেন ঠাকুর। দেবেনবাবু অনুযোগ করলেন, 'আপনি তো উপেনের জন্য কিছুই করলেন না।'

করুণাঘন দৃষ্টিতে ঠাকুর তাকালেন আমার বরের দিকে। বললেন, 'ও তো কিছুই চায় না। ওর ইচ্ছা, ছোট ঘরটি বড় হয়—তা হবে।'

সকলের দৃষ্টি আমার বরের দিকে। মাথা নিচু করে বসে আছে সে। হেমন্তের শিশিরবিন্দু ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে ঠাকুরের পায়ের পাতায়। কাঁদছে আমার বর। আকুল হয়ে সে কাঁদছে।

অন্তর্যামী নারায়ণ আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'হবে রে—খুউ-ব হবে।'

নববলে বলীয়ান হয়ে ফিরল আমার বর। পরিশ্রমী ছেলে, উদয়াস্ত ডুবে থাকে কাজ নিয়ে। মনের মধ্যে সদাজাগ্রত তাঁর অমোঘ আশ্বাসবাণী। বরাভয় পেয়েছে সে ঠাকুরের।

···ক'দিন ধরেই কানাঘুষা চলছে বইপাড়ায়। বৃন্দাবন বসাকের বই এর দোকান নাকি লাটে উঠছে। দোকান বেচে দেবে বৃন্দাবন।

আমার বর দেখল দু'চারজন আসছে, খোঁজখবর নিচ্ছে কর্তার কাছে। একদিন শুনল, পঁচাত্তর টাকা পেলে কর্তা বেচে দেবে দোকান।

আশার আলেয়া উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে আমার বরের মনে। হায়রে, যদি তার কিছু টাকা থাকত···

মামাকে বলল। টাকার অঙ্ক শুনে তেড়ে এলেন মামা। তাহলে উপায়! পায়ের তলায় মাটি যেন সরে যাচ্ছে দ্রুতবেগে। কিন্তু, ঠাকুর যে বলেছেন—ওর ছোট ঘরটি বড় হবে। হায় ঠাকুর!

একদিন যায়, দু'দিন যায়, কোনো সুরাহা দেখতে পেল না আমার বর। মনে মনে জানাল কাতর প্রার্থনা ঠাকুরের কাছে।

মামীমার নজর এড়াবে কি করে? মামী তো নামে, স্নেহে মায়েরও বাড়া। একরত্তি ছেলেটাকে মানুষ করেছেন পুত্রস্নেহে। মামীরও চোখে ঘুম নেই।

বাপের বাড়ি যাবার নাম করে সেদিন দুপুরে মামী বেরুলেন

ছেলেকে নিয়ে। বললেন—'চল বাবা আমার সঙ্গে। পৌঁছে দিয়ে দোকানে যাস।'

ছেলে চলল মামীর সঙ্গে। কিছুটা যাবার পর সন্দেহ হল তার। মামী এ রাস্তায় যাচ্ছে কেন! কোনো কথা না বলে সে চলল মামীর পিছু পিছু।

তারপর! তারপর আমার বর দেখল···

কেমন করে মামী স্যাকরার সামনে বসে নিজের তাগাজোড়া ওজন করাল, দরদস্তুর করল, গ'নে গ'নে টাকা নিল।

বাইরে দাঁড়িয়ে সে সব দেখল। দেখল বোবা হয়ে, মুখে তার রা'টি নেই। হঠাৎ মাথাটা বোধ হয় ঘুরে গেল তার। ঝাঁপের লাঠিটা ধরে সামলে নিল নিজেকে।···অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে রোদের মধ্যে, তাই কি? না, অতগুলো টাকা দেখে!

পেটকাপড়ে টাকা বেঁধে মামী নামলেন দোকান থেকে। ডাকলেন—'আয় এদিকে।'

চলল আমার বর। মাথাটা তখনও ঝিমঝিম করছে। পা দু'টো টেনে টেনে সে চলল মামীর পিছু পিছু।

ছেলেকে নিয়ে মামী এলেন গঙ্গার ধারে। ভরা দুপুর। ধারে কাছে লোকজন নেই। সামনে ছিল একটা চালা। মায়ে-ব্যাটায় বসলেন সেখানে।

তারপর···সব টাকা বার করলেন মামী। একটি একটি করে গ'নে তুলে দিলেন পঁচাত্তর টাকা ছেলের হাতে।

এক চোখে হাসি আর এক চোখে জল নিয়ে মামী তাকালেন ছেলের দিকে। বললেন, 'পারবি তো বাবা দোকান চালাতে—'

মাতৃকরুণায় অভিষিক্ত হয়ে ছেলে প্রণাম করল মামীমাকে। বলল, 'আমায় তুমি আশীর্বাদ কর মামীমা।'

আশীর্বাদ আরও একজন করলেন অন্তরীক্ষ থেকে। তিনি কে? তিনি! দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির ছোট ভটচায, রানী রাসমণির জামাই সেজবাবু যাঁকে ডাকতেন বাবা বলে—তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব।

ঠাকুর বলতেন জীবকোটি আর ঈশ্বরকোটি। বলতেন, 'ঈশ্বরকোটি কি জানিস? যেমন শ্রীচৈতন্য অবতার পুরুষ, কিংবা প্রহ্লাদের মতো শুদ্ধ সত্ত্বগুণী ভক্ত বা লীলাসহচর। ঈশ্বরকোটি না হলে মহাভাব, প্রেম হয় না। ঈশ্বরকোটির প্রেম হলে জগৎ মিথ্যা বোধ হয়, এমন কি শরীর যে এত ভালবাসার জিনিস, সেটাও ভুল হয়ে যায়। লীলাপ্রচারে সহায় হবে বলে, ঈশ্বরের সঙ্গে বিশেষ কোনো সম্বন্ধের ভাব নিয়ে তাঁরা আসেন এ পৃথিবীতে। কিন্তু, কোনো সময়েই সাধারণ মানুষের মতো সংসারে জড়ান না। এঁরা হলেন ঈশ্বরকোটি। আবার আর এক দল সাধক আছেন, মোক্ষলাভ করাই যাঁদের উদ্দেশ্য। অদ্বৈতভাব লাভ করে সেই যে গেলেন—এজন্মে বা লোককল্যাণের জন্য কোনোদিনই আর ফেরেন না।···ওই যে রে, বাড়ির গিন্নি—সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে, রান্নাঘরের সকড়ি ঘুচিয়ে, দুপুরবেলা কাঁধে গামছা নিয়ে সেই যে ঘাটে গেল; হাজার ডাকো, আর ফিরবে না।···তাঁরা হলেন জীবকোটি।'

ছেলেদের মধ্যে মাত্র ছয়জনকে ঠাকুর নির্দেশ করতেন ঈশ্বরকোটি বলে। নরেনদাদা, বাবুরামদাদা, যোগীনদাদা, নিরঞ্জনদাদা, পূর্ণদাদা আর রাখালদাদা। ত্যাগী সন্তানদের মধ্যে ঠাকুরের কাছে প্রথমে আসেন রাখালদাদা।

রাখালদাদা আসার আগে, ঠাকুর একদিন দেখেছিলেন, মা ভবতারিণী একটি ছেলেকে এনে বসিয়ে দিলেন ঠাকুরের কোলে। বললেন, 'এই নে তোর ছেলে।'

ভয়ে শিউরে উঠলেন ঠাকুর। বললেন, 'সেকি? আমার আবার ছেলে?'

হেসে উঠলেন মা-ভবতারিণী। আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'না রে, সেরকম ছেলে নয়। ত্যাগী মানসপুত্র।'

মনোমোহনদাদার সঙ্গে রাখালদাদা প্রথম যেদিন আসেন ঠাকুরকে দেখতে, ঠিক তার পূর্ব মুহূর্তে ঠাকুর ভাবাবস্থায় দেখলেন—অপরূপ শোভায় বিকশিত একটি শতদলপদ্ম ফুটে আছে গঙ্গার বুকে। বৃন্দাবনবিহারী ব্রজকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণের হাতে হাত রেখে আর একটি বালক নূপুর পায়ে কি মধুর ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছেন সেই পদ্মের উপর।

রাখালদাদাকে দেখা মাত্র চিনতে পারলেন ঠাকুর। হুবহু সেই একই মূর্তি। এই তো সেই কৃষ্ণসখা! স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন ঠাকুর রাখালদাদার দিকে কিছুক্ষণ। পরে, মনোমোহনদাদাকে লক্ষ্য করে বললেন—সুন্দর আধার। তারপর, যেন কতকালের চেনাজানা এমন ভাবে সাগ্রহে ঠাকুর তুলে নিলেন রাখালদাদার দু'টি হাত নিজের হাতের মধ্যে। কৌতুকভরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নামটি কি গো?'

ঠাকুরের পবিত্র স্পর্শে বিদ্যুতের মতো কি এক শিহরণ অনুভব করলেন রাখালদাদা। ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন, 'রাখাল।'

একটার পর একটা, সব মিলে যাচ্ছে। যেই শুনলেন রাখাল; ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণ আর পারলেন না নিজেকে সম্বরণ করতে। এক নিমেষে মন উঠে গেল সেই অতীন্দ্রিয় জগতে।

মনোমোহনদাদা থাকতেন কাঁসারিপাড়ার কাছে সিমুলিয়া পাড়ায়। বাড়ি কোন্নগরে। রামদাদা মনোমোহনদাদা দুই মাসীর দুই ছেলে। গৃহী ভক্তদের মধ্যে এঁরা দু'জনে প্রথমে আসেন

ঠাকুরের কাছে। প্রথম দর্শনেই চিনে নিলেন এঁরা কালীবাড়ির ছোট ভটচাযকে—পূর্ণব্রহ্ম সনাতনরূপে। আর জড়িয়ে গেলেন ঠাকুরের স্নেহজালে চিরদিনের মতো।

রাখালদা'র বিয়ে হয়েছিল মনোমোহনদাদার বোন বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে। ওঁদের পরিবারের সকলেই ঠাকুরের কৃপাধন্য। নতুন জামাইকে নিয়ে মনোমোহনদাদা এসেছিলেন ঠাকুরকে প্রণাম জানাতে। কোথা থেকে কি হয়ে গেল। বিস্ময় বিহ্বল মনোমোহন-দাদা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন।

সমাধি ভাঙল ঠাকুরের। বাড়ি ফেরার ইচ্ছা জানালেন মনোমোহনদাদা। প্রণাম করলেন দু'জনে। ভাবের ঘোর তখনও কাটে নি ঠাকুরের। রাখালদাদার চিবুকে হাত দিয়ে স্নেহ গদ্‌গদ কণ্ঠে ঠাকুর বললেন, 'আবার এসো।'

ফিরে এলেন রাখালদাদা মনটা কিন্তু পড়ে থাকল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে। স্নেহবিগলিত সেই স্বর, আবার এসো···প্রাণের মধ্যে কেবলই মোচড় দিচ্ছে। থাকতে পারলেন না রাখালদাদা। স্কুল পালিয়ে একা হাজির হলেন একদিন।

ঘরে ঢোকামাত্র অনুযোগের স্বরে ঠাকুর বললেন, 'তোর এখানে আসতে এত দেরি হল কেন?'

কি জবাব দেবে রাখালদাদা। মুখ তুলে যেই তাকালেন ঠাকুরের দিকে, সব ওলট-পালট হয়ে গেল। পাঁচবছর বয়সের মাতৃহারা এক বালক, এতদিন পরে যেন খুঁজে পেল তার মাকে ঠাকুরের মধ্যে। এক নিমেষে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাখালদাদা ঠাকুরের কোলে। দু'হাতে ঠাকুরের গলা জড়িয়ে, বুকে মুখ রেখে রাখালদাদার সে কি কান্না!

সেই সময়ের কথা ঠাকুর যা বলতেন, 'তখন রাখালের এমন ভাব

ছিল, ঠিক যেন তিনচার বছরের ছেলে। আমাকে ঠিক মায়ের মতন দেখত। থাকত থাকত হঠাৎ দৌড়ে এসে কোলে উঠে বসত আর নিঃসঙ্কোচে স্তন পান করত। বাড়ি তো দূরের কথা—এখান থেকে কোথাও এক পাও নড়তে চাইত না। আমাকে পেলে আত্মহারা হয়ে রাখালের ভিতরে যে কেমন বালকভাবের আবেশ হত তা বলে বোঝাবার নয়। তখন যে কেউ তাকে দেখত সেই অবাক হয়ে যেত। আর, আমিও ভাবের ঘোরে তাকে ক্ষীর ননী খাওয়াতাম, খেলা দিতাম। কত সময় কাঁধেও তুলেছি।'

গড়ে-পিটে মনের মতো করে ঠাকুর তৈরি করতে লাগলেন রাখাল-দাদাকে। ঠাকুরকে ছেড়ে কোথাও যেতে চাইতেন না রাখালদাদা। ঠাকুর বলতেন, 'রাখালের সাকারের ঘর, নরেনের নিরাকারের।'

কিন্তু, গোড়ার দিকে রাখালদাদার যাতায়াত ছিল ব্রাহ্মসমাজে নরেনদাদার সঙ্গে। স্কুলে ওঁরা একসঙ্গে পড়তেন। নরেনদাদার ঝোঁকে রাখালদাদা সই করেছিলেন সমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে।

দিবারাত্র ঠাকুরের মা মা ডাক, অনুক্ষণ সমাধিতে ডুবে থাকা—তার উপর ঠাকুরের দিব্যপ্রবাহে রাখালদাদার পূর্বসংস্কার মিলিয়ে গেল জলের দাগের মতো।

সেই সময়কার একটি ঘটনা রাখালদাদা বলতেন, একদিন ঠাকুরের ঘরে গান হবে বৈষ্ণব পদাবলী। ঠাকুর বসে আছেন ছোট চৌকিতে। গায়কেরা জিজ্ঞাসা করলেন, কি ধরনের পদ গাইবেন। ঠাকুর বিনীতভাবে বললেন, একটু গৌরাঙ্গের কথা গাও।

গান শুরু হল, 'লাখ লাখ কাঞ্চন জিনি রসে ঢরঢর গোরা মুছাও নিছনি···'

কীর্তনিয়া আখর দিচ্ছে, 'সখি! দেখলাম পূর্ণশশী হ্রাস নাই মৃগাঙ্ক নাই হৃদয় আলো করে'

কীর্তনিয়া আবার বলছে, 'কোটী শশীর অমৃত মুখ মাজা…'

ভাবে বিভোর হয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন ঠাকুর। প্রেমোন্মত্ত গোপিকার মতো শ্রীকৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করতে করতে কীর্তনিয়ার সঙ্গে আখর দিতে লাগলেন, 'সখি রূপের দোষ না মনের দোষ? আন হেরিতে, শ্যামময় হেরি ত্রিভুবন।'

শ্যামময়…এই কথা বলতে বলতে ঠাকুর সমাধিস্থ। গান চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সমাধি ভাঙল ঠাকুরের। কিন্তু মন তখনও ভাবরাজ্যে।

হঠাৎ ভাবের ঘোরে ঠাকুর গায়ের পিরানখানি সজোরে আকর্ষণ করলেন। মুহূর্তমধ্যে উন্মুক্ত হল দিব্যশরীর। দেখা গেল, ঠাকুরের সর্বাঙ্গে অশ্রু পুলক কম্পাদি!

মহাভাবে তিনি বলতে লাগলেন, 'প্রাণনাথ হৃদয়বল্লভ কৃষ্ণকে তোরা এনে দে, সুহৃদের কাজ তো বটে। হয় এনে দে, না হয় আমায় নিয়ে চল—তোদের চিরদাসী হব।'

অপলক দৃষ্টিতে রাখালদাদা তাকিয়ে থাকলেন ঠাকুরের দিকে। দিব্যপ্রবাহে ভেসে গেল তাঁর সর্ব সংশয়। সাকার উপাসনা সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ যাই বলুক না কেন, সাকার শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তনে এই যে ঠাকুরের সাত্ত্বিক বিকার—এর পিছনে নিশ্চয়ই একটা সত্য আছে যা বোঝানো যায় না।

মন প্রাণ সর্বস্ব সমর্পণ করলেন রাখালদাদা, কালীবাড়ির ছোট ভটচায শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণে।

এতদিন পরে 'চাকরি' পাকা হল আমার বরের। ভোরবেলা গঙ্গাস্নান সেরে দোকানে যায়। নতুন কেনা মা কালীর পটের

নিচে সাজিয়ে দেয় টাটকা তোলা দু'টি জবা ফুল। টগর ফুলের ছোট একটি মালা জড়িয়ে দেয় গণেশের গলায়। তারপর, দু'হাত জড় করে মাথা নুইয়ে প্রণাম জানায় তাঁকে—যাঁর আশীর্বাদে আজ সে পেয়েছে এই ছোট ঘর। ঠাকুর বলেছেন—কানে তার এখনও বাজছে···'ওর ছোট ঘরটি বড় হবে।'

ক'দিন ধরেই ভাবছে আমার বর, কিন্তু দোকান ছেড়ে যায় কি করে! হঠাৎ সেদিন মনটা ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠল। দুটি ভাত মুখে দিয়ে, ভর-দুপুরে ছুটল সে দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুর বসে ছিলেন ছোট চৌকিতে। ঘরে আর কেউ নেই। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল আমার বর ঠাকুরকে।

চুপচাপ বসে ছিলেন ঠাকুর। মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘ। ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকল আমার বর ঠাকুরের দিকে।

আচমকা বলে বসলেন ঠাকুর, 'হ্যাঁগো, নবীন চৌধুরীর ছেলে কি রকম লোক বলত? কানপুর যাবার আগে তার নিকট এখানকার পয়সাকড়ি কিছু ছিল, তার হিসাবও দেয় না, ডেকে পাঠালেও আসে না। যাবে একবার তার বাড়ি?'

আমার বর বুঝল, ঠাকুর যোগীনদাদার কথা বলছেন। কাছেই যোগীনদাদার বাড়ি। দক্ষিণেশ্বরে সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ির ছেলে যোগীনদাদা। যোগীনদাদা, বয়সে আমার বরের চেয়ে সাত বছরের বড়। যেমন লম্বা তেমনই রোগা। কিন্তু, কি সুন্দর চোখদুটি! ঠাকুর বলতেন যেন অর্জুনের চোখ। আর মা বলতেন, যোগীন আমার কৃষ্ণসখা গাণ্ডীবী অর্জুন। ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য ভগবানের নরলীলার সাথী হয়েছে।

উঠে দাঁড়াল আমার বর। ঠাকুরের অনুমতি নিয়ে যোগীনদাদার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। ভাবতে ভাবতে যাচ্ছে—

তাই তো, যোগীনদাদা ঠাকুরের এত প্রিয়পাত্র, অথচ···

ঠাকুর বললেন, সে আর আসে না ; পয়সা ছিল তার কাছে, ফেরত দেয় না। কি রকম যেন হেঁয়ালি মনে হচ্ছে।

তবে কি লজ্জায় আসছে না যোগীনদাদা, বিয়ে হয়েছে বলে!

বাড়িতেই ছিলেন যোগীনদাদা। ডাক শুনে বেরিয়ে এলেন। একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে যোগীনদাদা তাকালেন আমার বরের দিকে। বললেন, 'কি ব্যাপার, তুই হঠাৎ ?'

ঠাকুর যা যা বলেছেন, আমার বর সব শোনাল যোগীনদাদাকে। আরও বলল, 'কিসের পয়সা গো যোগীনদাদা ?'

রাগে দুঃখে থমথম করছে যোগীনদাদার মুখখানা। দিবারাত্র ধ্যানে ডুবে থাকার ফলে চোখ দু'টি তো সব সময় লাল হয়ে আছে, তার উপর যেই শুনলেন, ঠাকুর তাঁকে সন্দেহ করছেন কয়েক আনা পয়সার জন্য···ব্যাস্, আর যান কোথা !

হনহনিয়ে ঢুকে গেলেন বাড়ির মধ্যে। যাবার সময় বলে গেলেন, 'তুই একটু দাঁড়া উপেন। আমি এখনই আসছি।'

গেলেন আর তখনই ফিরলেন একটা কামিজ গায়ে চড়িয়ে। এদিকে খুব ঘাবড়ে গেছে আমার বর। যে যোগীনদাদাকে সে মাঝে-মধ্যে দেখেছে ঠাকুরের কাছে, তিনি ছিলেন কত শান্ত কত সঙ্কুচিত। পাছে কারও নজরে পড়ে যান সেই ভয়ে অতি গোপনে যাতায়াত করতেন ঠাকুরের কাছে। আর আজ ! সমস্ত লজ্জা, সঙ্কোচ ভেসে গেল অভিমানের ঝাপ্টা হাওয়ায়। চলতে চলতে আনমনে যোগীনদাদা বললেন, 'জানিস উপেন, আমার সকল আশা ভরসা গেছে বটে—তবু এখনও এত হীন হই নি যে, চুরি করব। তিনি কি আমাকে এত খারাপ ঠাওরান নাকি ?'

বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমেই বাড়তে থাকে। কিসের পয়সা, কেন

যোগীনদাদা ফেরত দেয় নি—জানতে ইচ্ছা করছে আমার বরের। অথচ সাহস নেই জিজ্ঞাসা করার।

আরও কিছুটা চলার পর যোগীনদাদা নিজেই সব বললেন, 'বুঝলি উপেন, কাল হল আমার কানপুর যাওয়া। তখন সবাই বলল, 'মেসোর কাছে যা—চাকরি পাবি। অভাবের সংসার; যদি কিছু সুরাহা হয়, এই ভেবে পাড়ি দিলাম কানপুর।···কিন্তু একি হল বলত? চাকরি তো হলই না, শেষে মায়ের কান্নায়—কি বিষ আমি খেলাম রে! ভেবে ছিলাম আর আমি যাব না ঠাকুরের কাছে। কোন মুখে তাঁর সামনে দাঁড়াব। হায় হায়, শেষে চোর বদনাম!··· কি একটা জিনিস আনতে দিয়েছিল আমায়, কালীবাড়ির খাজাঞ্চি— কানপুর যাবার আগে। যখন আনলাম, খাজাঞ্চি নেই। উদ্বৃত্ত চার আনা পয়সা ফেরত দেব কাকে! ঠাকুরকে বললাম। বললেন, রেখে দে। পরে দিবি'খন। অথচ···'

কি বলে যোগীনদাদাকে সান্ত্বনা দেবে বুঝে পায় না আমার বর। মুখ বুজে হেঁটে চলল যোগীনদাদার সঙ্গে।

ফিরে এল দু'জনে কালীবাড়িতে। দোর ঠেলে যোগীনদাদা ঢুকলেন ঠাকুরের ঘরে। আমার বর আর গেল না।

ঠাকুর বসে ছিলেন ছোট চৌকিতে। পরনের কাপড়খানি কোলের কাছে জড় করা। যোগীনদাদাকে দেখে নেমে এলেন ঠাকুর চৌকি থেকে।

বহুদিন অদর্শনের পর বাঞ্ছিত নিধিকে পেয়ে ভাবময় পুরুষের মন তখন অতীন্দ্রিয় জগতে। কি যেন এক অদৃশ্য শক্তির লীলা চলছে ঠাকুরের মধ্যে।

হাত ধরে যোগীনদাদাকে বললেন ঠাকুর, 'বে করেছিস—তা কি হয়েছে? এই যে আমি বে করেছি। বে করেছিস তা ভয় কি?

এখানকার কৃপা থাকলে একটা কি, লাখটা বে-তেও তোর কিছু করতে পারবে না। তোর যদি সংসারে থাকতে ইচ্ছা হয় তো তোর স্ত্রীকে একদিন এখানে নিয়ে আসিস। তাকে এমন করে দেব যে, তোর ধর্মপথে সহায় ছাড়া কখনও বিঘ্ন হবে না। আর যদি সংসার করতে ইচ্ছা না হয় তো বলিস, তোর মায়া মমতা সব খেয়ে ফেলব।'

ঘরে যোগীনদাদা আর বাইরে আমার বর—দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছে পাথর হয়ে।

···বে করেছিস তা কি হয়েছে?—একি নূতন কথা! একি স্বপ্ন না সত্য?

···এখানকার কৃপা থাকলে একটা কি, লাখটা বে-তেও তোর কিছু করতে পারবে না···

এই বুক ভরা আশার বাণী কে শোনাতে পারে? কে তিনি! তিনি? তিনি হলেন, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির ছোট ভটচায। রানী রাসমণির জামাই সেজবাবু যাঁকে ডাকতেন বাবা বলে।

তিনি—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।

কথাটা জানাজানি হয়ে গেল ভক্তদের মধ্যে। এতদিনে উপেনের একটা হিল্লে হল। সবাই খুশী। দেবেনবাবু চাকরি করতেন ঠাকুরবাড়ির স্টেটে পাথুরিয়াঘাটায়। অক্ষয় মাস্টারও থাকতেন সেখানে—ছেলেদের পড়াতেন। একদিন কথায় কথায় অক্ষয় মাস্টার কথাটা তুললেন দেবেনবাবুর কানে। বললেন, 'দাদা শুনেছেন, মনিবের দোকানটা উপেন কিনেছে --'

জমাখরচের খাতা থেকে চোখ তুলে দেবেনবাবু তাকালেন অক্ষয় মাস্টারের দিকে। যেন বিশ্বাস হয় না। চকিতে মনে পড়ল ঠাকুরের সেই অভয়বাণী—'ওর ছোট ঘরটি বড় হবে···'

শ্রীগুরুর আশীর্বাদ! রোমাঞ্চিত হলেন দেবেনবাবু।

কিসে উপেনের ভাল হয় এই চিন্তা সকলের। অক্ষয় মাস্টার ভাবেন, ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের জন্য কত বই তো কেনা হয়। আহা, যদি উপেনের দোকান থেকে কেনা যেত···।

বাড়ি ফেরার পথে দেবেনবাবু ডেকে নিলেন অক্ষয় মাস্টারকে। দু'জনে চললেন উপেনের দোকান দেখতে।

বেচাকেনা যা কিছু দিনের বেলায়। সন্ধ্যার পর বটতলায় লোকজন বেশী থাকত না। ভিড় জমত মেয়েদের আড্ডায়, চাটের দোকানে, আর হাফ-আখড়াই পার্টিতে। সেকালে লেখাপড়ার রেওয়াজ তত ছিল না।

বই বলতে এক পয়সার দু'পয়সার চুটকি বই—তাতে নানারকম ছড়া। কবির গান, মনসার গান, পাঁচালি···এই সব। ইদানীং কেউ কেউ আবার হাফ-আখড়াইয়ের গানও ছাপাতে শুরু করেছে।

বসে বসে আমার বর কেবল ভাবে, কি করে বিক্রি বাড়ানো যায়। অনেক রকম মতলব আসে তার মাথায়। বহুদিন এ লাইনে সে আছে। দেখে শুনে জ্ঞানও কিছুটা বেড়েছে। ভেবেচিন্তে ঠিক করল, বড় করে বই ছাপাতে হবে। কিন্তু বই কোথায়? লিখবে কে?

নিজে তো মা-সরস্বতীর বরপুত্তুর। অথচ, বই চাই। সিদ্ধি-দাতা গণেশ বসে আছেন মাথার উপর। তিনিই বুদ্ধি দিলেন।

অনেকগুলি চুটকি বই একত্র করে একটা বড় বই ছাপানো হল। সবই ধারের উপর। ছাপাখানার সঙ্গে রফা হল, বই বেচে দেনা মেটাবে। কাগজওলা বহুদিনের পরিচিত—অসুবিধা হল না। আর দপ্তরী! সে আসে মাঝে-মধ্যে। যখন যেমন পারে আমার বর তার পাওনা মিটিয়ে দেয়।

সাড়া পড়ে গেল বইপাড়ায়। সবাই দেখলে, উপেনের দোকানে

খদ্দেরের অভাব নেই। মা-লক্ষ্মী বোধ হয় এতদিনে মুখ তুলে চাইলেন। দু'পয়সার মুখ দেখল আমার বর।

একটু একটু করে সাহস বাড়ছে। এবার সে বুঝল, মনের মতো বই ছাপালে বিক্রি হবেই। চাহিদা মাফিক কিছু কিছু বই সে ছাপাতে লাগল। আর বিক্রিও বাড়ল হু-হু করে।

কিন্তু চালচলনে আমার বর তখনও যেন বৃন্দাবন বসাকের পাঁচ-টাকা মাহিনার চাকর। খালি পা, গায়ে ফতুয়া, আর কোমরের কাপড় হাঁটুর নিচে নামে না। গরীবের ঘরে খাটিয়ে ছেলে। উদয়াস্ত পরিশ্রমে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি ছিল না তার। অনির্বাণ হোমশিখা জ্বলছে তার মনের মণি কোঠায়—

'···ওর ছোট দুয়ারটি বড় হয়—তা হবে।'

সন্ধ্যা হয় হয়। ধুনো গঙ্গাজল দিয়ে আমার বর, মাথা নুইয়ে প্রণাম করছে। বাইরে কে যেন ডাকল, 'উপেন আছিস ?'

চেনা গলা। আমার বর দোকান থেকে বেরিয়ে এল। কোঁচার খুঁটটি তখনও গলায় জড়ানো। দেখল, দেবেনদাদা আর অক্ষয় মাস্টার।

পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছে···জড়িয়ে ধরলেন দেবেনদাদা। বললেন, 'তোর দোকান দেখতে এলাম রে।'

লজ্জায় সঙ্কোচে জড়িয়ে গেল আমার বর। ও যে দোকানের মালিক হয়েছে সে বোধটা তখনও ওর মনে ভাল করে দাগ কাটতে পারে নি।

দাদাদের নিয়ে দোকানে ঢুকল। সম্বল মাত্র নড়বড়ে একখানা বেঞ্চ। খদ্দের এলে ওতেই বসে। উড়ুনি দিয়ে ভাল করে মুছে দাদাদের বসাল। তারপর, আসছি বলে দৌড় দিল দোকান থেকে।

কেরোসিন কাঠের আলমারির মধ্যে নতুন সব বই সাজানো।

এগিয়ে গেলেন দেবেনদাদা। ঘুরে ঘুরে দেখলেন, কেমন সব বই ছাপিয়েছে আমার বর। দেবেনদাদা লেখাপড়া জানা লোক। নিজে গান বাঁধতে পারতেন। আহা কি সব সুন্দর গান!

গানের কথা মনে পড়তে খুশীর আমেজে ভরে উঠল বসুমতী-মার মুখখানি। আমার স্বামীর দিকে তাকিয়ে মা বললেন,—শুনেছ বাবা দেবেনদাদার গান?

তারপর, নিজেই আপন মনে গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন··· এল তোর দুষ্টু ছেলে তুষ্ট করে নে মা কোলে।

স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টিখানি আমাদের দিকে প্রসারিত করে বসুমতী-মা আবার খেই ধরলেন তাঁর কাহিনীর:

আহা, কি সব গানই না বাঁধত দেবেনদাদা। আর, সুরও ছিল তেমনি, প্রাণমাতানো।

ঘুরে ঘুরে দেখছেন দেবেনদাদা। অক্ষয় মাস্টারও দেখছেন এক একটা বই আলমারি থেকে বার করে। এমন সময় এল আমার বর। এক হাতে কচুরির ঠোঙা আর অন্য হাতে এক দোনা পান।

পরিপাটি করে দাদাদের খাওয়ানো হল। পান মুখে দিয়ে দেবেনদাদা আমার বরকে বললেন, 'বই যা ছাপিয়েছিস দেখলাম। বেশ হয়েছে। তা, বিক্রি কেমন?'

ভাল হয়েছে শুনে আমার বর বেজায় খুশী। দু'হাত মাথায় ঠেকিয়ে বলল, 'তাঁর আশীর্বাদে ভালই হচ্ছে। তবে, বোঝেন তো— পুঁজির অভাব।'

হঠাৎ কি যেন এক মতলব এল দেবেনদাদার মাথায়। কিছুক্ষণ ভাবলেন দেবেনদাদা, তারপর বললেন, 'তুই যদি চাস উপেন, বড়দাকে বলে দেখতে পারি।'

বড়দাদার নাম শুনে শিউরে উঠল আমার বর। কবি সুরেন্দ্রনাথ

মজুমদার দেবেনদাদার অগ্রজ। কত সব কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি। তাঁর বই প্রকাশ করার সৌভাগ্য হবে আমার বরের। এ যে ভাবাই যায় না।

আমার বর ঘামতে শুরু করল। সে যে অনেক টাকার ফের! অত টাকা পাবে কোথায়?

বুঝতে পারলেন দেবেনদাদা। বললেন, 'ঘাবড়াচ্ছিস কেন? শুধু বিক্রি করার দায়িত্ব নিতে পারবি না?'

হ্যাঁ না কিছুই বলছে না আমার বর। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল দেবেনদাদার দিকে। দেবেনদাদার প্রস্তাব তার কাছে এতই অভাবনীয় যে বিশ্বাস করার সাহসও তার নেই।

বৃন্দাবন বসাকের পাঁচটাকা মাইনের চাকর উপেন মুকুয্যে, ঠাকুরের আশীর্বাদে না হয় দু'চারখানা বই ছাপিয়েছে—তাই বলে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সমস্ত কাব্যগ্রন্থ বিক্রির স্বত্ব পাওয়ার স্বপ্ন সে দেখবে কি করে। মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে যেন···

হঠাৎ একটা ছবি যেন ভেসে উঠল তার চোখের উপর। ঠাকুর শুয়ে আছেন দেবেনবাবুর বৈঠকখানায়। পায়ের তলায় বসে আছে সে আর অক্ষয় মাস্টার। মিটিমিটি হাসছেন ঠাকুর। বলছেন, ওর ছোট ঘরটি বড় হয়—তা হবে···

দোকানে খাটুনি বেশ বেড়েছে। এতদিন, নিজের ছাপানো বই নিয়ে মশগুল হয়ে ছিল আমার বর। এখন আবার সুরেনবাবুর বই আসছে। আরও দু'টি আলমারি এসেছে দোকানে কাব্যগ্রন্থের জন্য। শুধু কলকাতার লোকই কিনছে না, বাইরে থেকেও আসছে মানুষজন বই কিনতে।

বইপাড়া বন্ধ দেড়দিন। শনিবার একবেলা আর রবিবার সারা দিন। ওই সময়টুকুও বসে থাকা যায় না। ছুটতে হয় আমার বরকে ছাপাখানায়, দপ্তরীর বাড়ি।

ক'দিন যাবত মনটা বড় ভারী হয়ে আছে। বাড়ি ফিরে রাত্রিবেলা কত কথা বলত আমার বর মামীর সঙ্গে। সারাদিনের সমস্ত ঘটনা মামীকে না শুনিয়ে শান্তি পেত না সে। কত টাকা বিক্রি হল, বাজারে দেনা কত, নতুন বই কি ছাপাবে—মামীর মত না নিয়ে কোনো কাজই সে করত না। কিন্তু, কি যে হল ছেলের কে জানে। ভয়ানক অন্যমনস্ক। পাঁচবার ডাকলে তবে সাড়া পাওয়া যায়।

ভয় হল মামীর। সলা-পরামর্শ শুরু হল ননদ-ভাজে। বয়স কালের ছেলে, হাতে টাকা পয়সা আসছে—তাই হয়তো মন উড়ুউড়ু। সমাধানে এলেন দুই শাশুড়ী। বিয়ে দিয়ে স্থিতি করবেন ছেলেকে।

সেদিন ছিল শনিবার। বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া করল আমার বর। তারপর উড়ুনি কাঁধে বেরুচ্ছে দেখে মামী ডাকলেন, 'এই ভর-দুপুরে যাচ্ছিস কোথা? একটু গড়িয়ে নে। তারপর রোদ পড়লে বেরুবি।'

থমকে দাঁড়াল আমার বর। বলল, 'একবার দক্ষিণেশ্বর যাব মামীমা। বড় মন টানছে—'

তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মামীর কাছে। মিনতির সুরে বলল, 'আজকের রাতটা ওখানে থাকব মামীমা—ঠাকুরের কাছে···'

একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে মামী ছেলেকে বললেন, 'তোর মামা খোঁজ করবে, কি বলব?'

ছেলে বুঝল মামীর মত আছে। শুধু মামার ভয়ে রাজী হচ্ছে না। সেও পেয়ে বসল। বলল, 'তোমার দু'টি পায়ে পড়ি মামীমা, শুধু আজকের রাতটা—'

ছেলের মায়ায় গলে গেলেন মামীমা। আর বাধা দিলেন না। পিছন ফিরতেই আবার ডাক দিলেন ছেলেকে, 'খুব ভোরে পালিয়ে আসবি। তোর মামা ওঠার আগেই।'

'আচ্ছা' বলে বেরিয়ে পড়ল আমার বর। এল হাটখোলায় ফেরীঘাটে। তখনকার দিনে বেশীর ভাগ লোক যাতায়াত করত পানসী বা গয়নার নৌকায়। আমার বর এসে দেখল, রাখালদাদা আর বাবুরামদাদা পাশাপাশি বসে আছেন নৌকায়। রাখালদাদা চেঁচিয়ে উঠলেন আমার বরকে দেখে, 'কিরে উপেন, যাচ্ছিস নাকি?'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল আমার বর। তারপর উঠে পড়ল নৌকায়। একজন দু'জন করে যাত্রী উঠছে। নৌকা ছাড়ার সময় হল। নোঙর তুলে মাঝি নৌকা ঠেলছে, এমন সময় হাজির হলেন রামদয়াল চক্রবর্তী। ঠাকুরের আর একজন ভক্ত। বাবুরামদাদাকে দেখে চক্রবর্তীমশাই রাখালদাদাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আবার কাকে নিয়ে চললে?'

বাবুরামদাদার সঙ্গে চক্রবর্তীমশাই এর পরিচয় করিয়ে দিলেন রাখালদাদা। বললেন, এর নাম বাবুরাম ঘোষ। আমার সঙ্গে পড়ে মাস্টারমশাই-এর স্কুলে।'

নাম শুনে চক্রবর্তীমশাই বাবুরামদাদাকে বললেন, 'তুমিই বাবুরাম? যাওনি কেন দক্ষিণেশ্বরে? পরমহংসমশাই কেবল খোঁজ করছেন। সেদিন আমায় কত করে বললেন তোমাকে খবর দিতে। ওখান থেকে ফিরে আমি সোজা গেলাম মাস্টারমশাইএর বাড়ি কম্বুলিয়াটোলায়। তিনি কিছু বলেন নি তোমাকে?'

মেট্রোপলিটান স্কুলের হেড-মাস্টার, মহেন্দ্র গুপ্ত। ঠাকুরের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। আর সেই স্কুলে তখন পড়ত রাখাল, বাবুরাম, সুবোধ, পূর্ণ, তেজচন্দ্র, পল্টু, ক্ষীরোদ, নারায়ণ, এঁরা সব। মাস্টার-

মশাইএর দৌলতে একে একে এরা সবাই জড় হয়েছিল ঠাকুরের স্নেহচ্ছায়ায়। একে একে ছেলেরা যাচ্ছে ঠাকুরের কাছে আর বাঁধা পড়ছে তাঁর প্রীতিডোরে।

ছেলেদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে বাড়ির লোকেরা প্রমাদ গুণল। যত শাসন করে ছেলেদের, ফল হয় উলটা। শেষে দেখা গেল, স্কুলের ফাঁকে ফাঁকে তারা পালায় দক্ষিণেশ্বরে। আবার লক্ষ্মী ছেলের মতো বাড়ি ফেরে ছুটির সময়।

যত রাগ, সব আছড়ে পড়ে মহেন্দ্র মাস্টারের উপর। কিন্তু করার কিছুই নেই। অবশেষে সবাই বলতে শুরু করল ছেলেধরা মাস্টার। কেউ কেউ আবার নাম কাটিয়ে ছেলেকে ভর্তি করাল অন্য স্কুলে।

পূর্ণদাকে নিয়ে খুব ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল মাস্টার-মশাইকে। তের বছর বয়সে পূর্ণদা দেখলেন ঠাকুরকে। দুধের ছেলে, সংসার সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই নেই। মিষ্টি ভাষা, মধুর স্বভাব, ডাগর চোখ, সুঠাম দেহ…মাস্টার-মশাইএর নজরে এলেন পূর্ণদা। কথা বলে মাস্টারমশাই বুঝলেন, ছেলেটি ভগবদ্ভক্ত। তারপর, সুযোগ বুঝে একেও নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।

ভবতারিণীর মন্দির, বিষ্ণুমন্দির, সব দেখলেন পূর্ণদা মাস্টার-মশাইএর সঙ্গে। শেষে দু'জনে এলেন ঠাকুরের ঘরে। ছোট চৌকির উপর বসেছিলেন ঠাকুর। হাঁটুমুড়ে মাস্টার-মশাই প্রণাম করলেন। তারপর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ঠাকুরের দিকে।

নীরব নিস্পন্দ পূর্ণদা। আনন্দে মুখখানি যেন টসটস করছে। আর ফোঁটায় ফোঁটায় জল গড়িয়ে পড়ছে দু'চোখ বেয়ে।

সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে থাকলেন মাস্টার-মশাই পূর্ণদার দিকে অনেকক্ষণ কেটে গেল। ফেরার সময় এগিয়ে আসছে। ডাক দিলেন মাস্টার-মশাই—

'বাড়ি যাবে না পূর্ণ ? সময় হয়ে গেছে···'

মাস্টার-মশাইর ডাকে পূর্ণদার হুঁশ এল। এতক্ষণ যেন ঘুমিয়ে ছিলেন পূর্ণদা। উঠে দাঁড়াতেই নেমে এলেন ঠাকুর পূর্ণদার কাছে। চিবুকটি ছুঁয়ে স্নেহভরে বললেন, 'তোর যখন সুবিধা হবে চলে আসবি। গাড়িভাড়া এখান থেকে নিবি।'

ফিরে যেতে মোটেই ইচ্ছা নেই পূর্ণদার। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

বাড়িতে কড়া শাসন। পূর্ণদার বাবা, রায়বাহাদুর দীননাথ ঘোষ। বাড়ি সিমুলিয়ায়। অভিজাত পরিবারের ছেলে পূর্ণদা। এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবার স্বাধীনতা নেই অথচ···ঠাকুরকে দেখবার জন্য প্রাণটা ছটফট করে। কখনও মাস্টার-মশাইকে নিয়ে আবার কখনও বা একা চলে আসেন দক্ষিণেশ্বরে।

ঠাকুর বলতেন, 'পূর্ণ উঁচু সাকার ঘর, বিষ্ণুর অংশে জন্ম। আহা, কি অনুরাগ! ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা না থাকলে এমনটি হয় না। এ-তিনজনের পুরুষসত্তা—নরেন, ছোট নরেন আর পূর্ণ।···কেন পূর্ণ, নরেন এদের ভালবাসি ? জগন্নাথের সঙ্গে মধুরভাবে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাত ভেঙে গেল—জানিয়ে দিলে, তুমি শরীর ধারণ করেছ, এখন নররূপের সঙ্গে সখ্য, বাৎসল্য এই ভাব নিয়ে থাকে।'

তবুও দু'চারদিন দেখতে না পেলে পূর্ণদার জন্য ঠাকুর ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। সুবিধামতো নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য লুকিয়ে পাঠাতেন পূর্ণদার জন্য মাস্টার-মশাইএর কাছে, স্কুলে। সময় সময় অঝোরে কাঁদতেন ঠাকুর, পূর্ণদার জন্য। কেউ কেউ মন্তব্য করলে বলতেন, 'পূর্ণর উপর এই টান দেখে তোরা অবাক হচ্ছিস, নরেনের জন্য প্রথম প্রথম প্রাণ যে রকম ব্যাকুল হত ও যেরকম ছটফট করতুম

তা দেখলে না জানি কি হতিস !···পূর্ণকে আর একবার দেখলেই ব্যাকুলতা একটু কম পড়বে।'

বোধ হয় টের পেলেন পূর্ণদার বাবা। সব সময় চোখে চোখে রাখতেন পূর্ণদাকে। এদিকে ঠাকুর কেবল ঘরবার করছেন পূর্ণদার জন্য। শেষে আর থাকতে না পেরে ছুটলেন মাস্টার-মশাইএর বাড়ি।

পড়ার ঘরে পূর্ণদা রাত্রিবেলা একা বসে বই পড়ছিলেন। হঠাৎ শুনলেন, জানালায় ঠুকঠুক আওয়াজ। মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, মাস্টার-মশাই দাঁড়িয়ে আছেন অন্ধকারে চোরের মতো। মৃদুস্বরে মাস্টার-মশাই বললেন, 'শ্যামপুকুরে রাস্তার মোড়ে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন তোমার জন্য। চুপিচুপি চলে এস।'

সবার অলক্ষ্যে পূর্ণদা বেরিয়ে এলেন বাড়ি থেকে। এলেন ঠাকুরের সামনে। নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না ঠাকুর। দু'হাতে টেনে নিলেন পূর্ণদাকে বুকের মধ্যে। চোখের জলে ভিজে গেল পূর্ণদার সারা অঙ্গ। অনেকক্ষণ পরে কিছুটা হালকা হয়ে ঠাকুর বললেন পূর্ণদাকে—'তোর জন্য সন্দেশ এনেছি, তুই খা।'

এই বলে নিজের হাতে খাইয়ে দিলেন পূর্ণদাকে একটু একটু করে। তারপর তিনজনে গেলেন মাস্টার-মশাইএর বাড়ি। সেখানে বসে পূর্ণদার সঙ্গে ঠাকুরের কত কথা হয় ধ্যানজপ সম্বন্ধে।

কথায় কথায় জানতে চাইলেন ঠাকুর, 'স্বপ্নে কি দেখিস ?'

পূর্ণদা উত্তর দিলেন—'আজ্ঞে, আপনাকে দেখি—বসে আছেন। কি বলছেন।'

উৎসাহভরে ঠাকুর আবার বললেন, 'আমাকে তোর কি মনে হয় বল্ দেখি ?'

যেন দৈবীপ্রেরণায় ভক্তি গদ্গদ কণ্ঠে পূর্ণদা বললেন, 'আপনি ভগবান, সাক্ষাৎ ঈশ্বর।'

এতটুকু ছেলে, তার মুখে একি কথা! অবাক হয়ে গেলেন ঠাকুর পূর্ণদার উত্তর শুনে। মাস্টার-মশাইএর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, পূর্ণ ছেলেমানুষ, বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নি—সে কেমন করে ঐ কথা বুঝল বল দেখি! নিশ্চয়ই পূর্বজন্মকৃত সংস্কার। এদের শুদ্ধ সাত্ত্বিক অন্তরে সত্যের ছবি স্বভাবত পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ...খুব ভাল আধার। তা না হলে ওর জন্য জপ করিয়ে নিলে! ওতো ঐ সব কথা জানে না।'

কাহিনী বলার নেশায় যেন পেয়ে বসেছে বসুমতী-মাকে। আপন মনে বলছেন :

হাটখোলা ছেড়ে নৌকা এগিয়ে যাচ্ছে। গায়ে-গায়ে বসে আছেন রামদয়ালবাবু, রাখালদাদা, বাবুরামদাদা আর আমার বর। নৌকা এল বাগবাজারে, ঁচালিঘাটে। দু'চারজন লোক উঠল। ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়ছে আর ছাড়ছে লোক নিয়ে।

রাখালদাদার যাতায়াত আছে দক্ষিণেশ্বরে, বাবুরামদাদা তা জানতেন না। আর ওখানকার সম্বন্ধে তাঁর কোনো পরিষ্কার ধারণাও ছিল না। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। রাখালদাদা জিজ্ঞাসা করলেন বাবুরাম দাদাকে, 'রাত্রে ওখানে থাকবে কি?'

এ-ব্যাপারে কোনো চিন্তা করে আসেন নি বাবুরামদাদা। শুধু বলে এসেছেন দিদিকে।

বাবুরামদাদার বড় বোন কৃষ্ণভামিনী, বলরামবাবুর স্ত্রী। দিদির বাড়ি থেকে বাবুরামদাদা স্কুলে পড়তেন।

বলরামবাবু ঠাকুরের আপনজন। ঠাকুর বলতেন, 'বলরামের পরিবার ভক্ত পরিবার। বলরামের অন্ন শুদ্ধ অন্ন।'

আর, বাবুরামদাদার মা, তিনিও অনেক আগে কৃপা পেয়েছিলেন ঠাকুরের—বলরামবাবুর আগ্রহে। অথচ, বাবুরামদাদা প্রথম ঠাকুরকে দেখেন জোড়াসাঁকোর এক হরিসভায়। কিন্তু তখন তিনি জানতেন না—ইনিই দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব।

অবশ্য বাবুরামদাদার বড় ভাই তাঁকে একদিন বলেছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন যাঁর ঘন ঘন ভাবসমাধি হয়।

নিছক কৌতূহলের বশে, কাউকে কিছু না বলে বাবুরামদাদা একদিন হাজির হয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। ধারে কাছে কেউ ছিল না। ছোট চৌকির উপর বসেছিলেন ঠাকুর। মনে হল, কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেন বাবুরামদাদা। ভাবছিলেন, ঘরে ঢুকবেন কিনা।

দেখতে পেয়ে ঠাকুর ডাকলেন, 'কিগো, বাইরে কেন? ভিতরে এস।'

যেন কতকালের চেনা-জানা। বসালেন নিজের পাশটিতে। গায়ে-পিঠে হাত বুলিয়ে কত আদর করলেন বাবুরামদাদাকে। তারপর যেই শুনলেন, বলরামের স্ত্রী কৃষ্ণভামিনীর ভাই—ঠাকুরের খুশী আর ধরে না। বললেন,—

'তাই বল, তোমরা যে আমার আপনার লোক গো। তোমার মাও তো এখানে এসেছে। আহা, বড় ভক্তিমতী তোমার মা। তার ছেলে তুমি—আসতেই হবে। আমি যে তোমাদের মুখ চেয়ে বসে আছি গো...'

স্কুলে ফিরতে হবে। ছটফট করছেন বাবুরামদাদা। ঠাকুর বললেন, 'কি হল, অমন পালাই পালাই করছ কেন?'

বাবুরামদাদা বললেন, 'স্কুল পালিয়ে এসেছি। ছুটির আগে ফিরতে হবে।'

নেমে এলেন ঠাকুর চৌকি থেকে। প্রসাদী সন্দেশ বার করলেন। নিজের হাতে জল গড়িয়ে খেতে দিলেন বাবুরামদাদাকে। তারপর, খাবার সময় বাবুরামদাদার হাত দু'টি ধরে বললেন, 'কিগো, ভুলে যাবে না তো ? আবার এস।'

ঘর থেকে বেরিয়ে বাবুরামদাদা শুনতে পেলেন, সুর করে ঠাকুর গান ধরেছেন—

মনের কথা কইব কি সই ? কইতে মানা।
দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না···

—নৌকা চলেছে দক্ষিণেশ্বরের দিকে। চুপচাপ বসে আছেন বাবুরামদাদা, অন্যমনস্ক। জবাব না পেয়ে রাখালদাদা বললেন, 'কি হল, থাকবে নাকি আজ রাত্রে দক্ষিণেশ্বরে ?'

দক্ষিণেশ্বর সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নেই বাবুরামদাদার। পালটা প্রশ্ন করলেন রাখালদাদাকে, 'সেখানে থাকার জায়গা হবে কি ?'

রহস্য করে রাখালদাদা বললেন, 'হয়তো হয়ে যাবে।'

তখনও ভাল করে ঘোর কাটে নি বাবুরামদাদার। তাই রাখালদাদার ঠাট্টা ধরতে পারলেন না। কৌতূহল ভরে জানতে চাইলেন, 'রাত্রে খাবারের কি হবে ?'

মুচকি হেসে রাখালদাদা বললেন, 'যেমন করে হোক হয়ে যাবে।'

নৌকা ঠেকল চাঁদনীর ঘাটে। মন্দিরে মন্দিরে আরতি শুরু হয়েছে। কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজে গমগম করছে কালীবাড়ি। একে একে নামলেন—চক্রবর্তী মশাই, রাখালদাদা, বাবুরামদাদা আর আমার বর। পোস্তার উপর ফুলবাগানের লাগোয়া রাস্তা ধরে সকলে গেলেন ঠাকুরের ঘরে।

ঠাকুর নেই। ওঁদের বসতে বলে রাখালদাদা গেলেন ভবতারিণীর মন্দিরে। ঠাকুরকে আনতে।

অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে রাখালদাদা এলেন ঠাকুরের হাত ধরে। ভাবের ঘোরে ঠাকুর টলমল করছেন। দক্ষিণের বারান্দায় সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে গেলেন রাখালদাদা। ঠাকুরকে বললেন, 'এখানটায় সিঁড়ি, উঠতে হবে। তারপর একটি একটি পা ফেলে তুলে আনলেন ঠাকুরকে।'

ছোট চৌকিতে বসানো হল ঠাকুরকে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন এঁরা তিনজন।

ঠাকুর তখনও ভাবের ঘোরে। আস্তে আস্তে মনটা নামছে। সহজ অবস্থায় ফিরে এসে সকলের কুশল সংবাদ নিলেন ঠাকুর। শেষে নরেনদার খবর জানতে চাইলেন চক্রবর্তী মশাইএর কাছে। বললেন, 'হ্যাঁগো, সে কেমন আছে? অনেক দিন এখানে আসে নি। তাকে দেখতে বড় ইচ্ছা হয়। তাকে একবার বল না—এখানে আসতে।'

হঠাৎ কি যেন মনে হল ঠাকুরের। নেমে এলেন চৌকি থেকে। বাবুরামদাদার পাশে এসে বসলেন। কথায় কথায় বাবুরামদাদার একটা হাত তুলে ধরলেন নিজের দু'হাতে। কনুই থেকে আঙুল পর্যন্ত হাতখানির ওজন মাপা হল। হাতের গড়ন, আঙুলের মাপ, পায়ের লক্ষণ, চোখ মুখ সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন ঠাকুর। শেষে সবকিছু মনোমত হওয়ায় নিজের মনে বলে উঠলেন—বেশ বেশ।

তারপর রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত চলল সাধন-ভজন সম্বন্ধে নানা উপদেশ।

রাখালদাদা যেন বাড়ির গিন্নি। খাওয়ানো, শোয়ার ব্যবস্থা করা, সব ভার রাখালদাদার।

মাঝ রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ঠাকুরের ডাকে। ধড়মড় করে উঠে পড়ল ছেলেরা। দেখল, এক দিগম্বর বালক দাঁড়িয়ে আছে বিছানার পাশে। পরনের কাপড়খানি বগলে চেপে ঠাকুর ডাকছেন চক্রবর্তী মশাইকে—

'ওগো ঘুমুলে?'

শশব্যস্তে রামদয়ালবাবু বললেন, 'আজ্ঞে না—'

কি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করছেন ঠাকুর। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'দেখ নরেনের জন্য বুকের মধ্যে যেন গামছা নিংড়াবার মতো জোরে মোচড় দিচ্ছে। তাকে একবার দেখা করে যেতে বলো। সে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আধার। সাক্ষাৎ নারায়ণ, তাকে মাঝে মাঝে না দেখলে থাকতে পারিনে।'

বাবুরামদাদা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন ঠাকুরের দিকে। কে সেই নরেন, যার জন্য ঠাকুরের এত আর্তি! প্রেমাস্পদের জন্য একি নিদারুণ ব্যাকুলতা। এই কি তবে শ্রীমতীর বিরহ!

রেখায় রেখায় অপরূপ মিল। ভাবে ছন্দে একই সুর। একই ব্যথা, একই বেদনা। বাবুরামদা। দেখছেন…তাঁর সামনে, যেন দাঁড়িয়ে আছেন প্রেমময়ী শ্রীরাধা। বিরহব্যাকুল তনু, কণ্ঠে দয়িতের জন্য আকুল আহ্বান—

এনে দে গো তারে সখি, এনে দে গো তারে…

বাবুরামদাদা ভুলে গেলেন তাঁর বর্তমান পরিবেশ। শ্রীমতীর অংশে জাত বাবুরামদাদা দেখতে পেলেন, তাঁর শৈশবস্বপ্ন আজ কি ভাবে বাস্তবে পরিণত হল। এই তো পূতসলিলা সুরধুনী, এই তো সেই নির্জন পঞ্চবটী, আর এই তো তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত সাধনভূমি—কি মনোরম! কি নিস্তব্ধ!!

কালীঘরের ছোট ভটচার্য, দক্ষিণেশ্বরের সেই পাগলা বামুন…

রানী রাসমণির জামাই, সেজবাবু যাকে ডাকতেন বাবা বলে···সেই তিনি, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস গ্রহণ করলেন বাবুরামদাদাকে বিশ্বস্ত সেবকরূপে, স্নেহাস্পদ পার্ষদরূপে।

চিরদিনের জন্য বিকিয়ে গেলেন বাবুরামদাদা ঠাকুরের শ্রীচরণে।

—সেদিন ছিল মঙ্গলবার। দুপুরে দোকান বন্ধ করছে আমার বর, হঠাৎ হাজির হলেন নিরঞ্জনদাদা। খেয়ালী মানুষ। দুপুরে দোকানে খদ্দের থাকে না, নিরিবিলিতে হয়তো একটু গল্প করতে এসেছেন এই ভেবে আমার বর তালা খুলতে গেল দোকানের। নিরঞ্জনদাদা বললেন, 'কি হল, আবার খুলছিস যে—বাড়ি যাবি না ?'

আমার বর বলল, 'তুমি বসবে না ?'

ক্লান্তকণ্ঠে নিরঞ্জনদাদা বললেন, 'দূর পাগল। দেখছিস না পূজা দিতে যাচ্ছি সিদ্ধেশ্বরীতলায়। রাখালের খবর এসেছে বৃন্দাবন থেকে। সেরে উঠেছে। ঠাকুর পাঠালেন মানত শোধ করতে।'

এতক্ষণে হুঁশ হল আমার বরের। দেখল নিরঞ্জনদাদার এক হাতে ডাব আর অন্য হাতে এক ঠোঙা চিনি।···মনে পড়ল ঠাকুরের কি দুশ্চিন্তা—রাখালদাদার অসুখের খবর পেয়ে। সে সময়ে প্রায়ই বলতেন, 'রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল। যে যেখান থেকে শরীর ধারণ করে, সেখানে গেলে প্রায়ই তার শরীর থাকে না।'

মনে পড়ল আমার বরের, আকুলকণ্ঠে ঠাকুরের সে কী প্রার্থনা মায়ের কাছে—

'মা কি হবে ? তাকে ভাল করে দে। সে যে ঘর বাড়ি ছেড়ে আমার উপর সব নির্ভর করেছে।'

আবার কখনও বা মানত করতেন, 'মা সিদ্ধেশ্বরী, তোকে ডাব চিনি দেব মা—আমার রাখালকে সুস্থ করে দে মা···'

আমার বরের আর বাড়ি ফেরা হল না। চলল নিরঞ্জনদাদার সঙ্গে কালীবাড়ি।

প্রসাদী নির্মাল্য নিয়ে ফিরছেন দু'জনে। নিরঞ্জনদাদা থাকতেন মামারবাড়ি, আহিরিটোলায়। আমার শ্বশুরবাড়ির কাছেই। এঁদের সঙ্গে অনেকদিনের জানা-শোনা।

ছেলেবয়েস থেকে পাড়ায় নিরঞ্জনদাদার খুব নামডাক। ভয় যে কি জিনিস নিরঞ্জনদাদার কোষ্ঠীতে লেখা ছিল না। মুখখানি ছিল সরলতা মাখানো। আর চোখদুটি দেখলে মনে হত যেন দিব্যজ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। দোষের মধ্যে এক, কাঠ গোঁয়ার। কাউকেই গ্রাহ্য করতেন না নিরঞ্জনদাদা।

ভূত নামানো, একটা হুজুগ উঠেছিল সে সময়ে। ডাক্তার প্যারীচাঁদ মিত্তির থাকতেন ওঁদের পাড়ায়। তাঁর বাড়িতে আড্ডা জমত ভুতুড়ে দলের। আর নিরঞ্জনদাদার উপর ভূতের আবেশ হত।

কত সব আজগুবী কাণ্ড করত ছেলেরা নিরঞ্জনদাদাকে দিয়ে। কারুর গয়না হারিয়েছে, ছুটল ওদের কাছে। ভূত নামানো হল। নিরঞ্জনদাদার মুখ দিয়ে ভূত বলল—গয়না কে নিয়েছে। কারুর টাকা চুরি হয়েছে, বলে দিল ভূত—কে নিয়েছে। এমন কি দুরারোগ্য ব্যাধিও সারিয়ে দিতেন নিরঞ্জনদাদা ভূতের দৌলতে। ফলে সবাই খুব খাতির করত নিরঞ্জনদাদাকে।

একদিন ঝোঁক চাপল ছেলেদের, যাবে দক্ষিণেশ্বর চুড়ইভাতি করতে। দলবেঁধে সবাই এল রানী রাসমণির বাগানে। এলেন ডাক্তার প্যারীচাঁদবাবুও। ঝাউপুকুরের পাড়ে রান্নার ব্যবস্থা হয়েছে। কুঠীবাড়ির গা ঘেঁষে একদল মেতেছে গান-বাজনায়।

কি কাজে যেন ঠাকুর বেরিয়েছিলেন। গানের টানে পায়ে-পায়ে হাজির হলেন ওদের কাছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন দেখে কে যেন বসতে বলল ঠাকুরকে। আপনভোলা সদাশিব ঠাকুর বসে পড়লেন বিনা দ্বিধায়।

ওরা কিন্তু চিনত না ঠাকুরকে। এদিকে, একনজরে ঠাকুরকে দেখে মিত্তির-মশাইয়ের মাথায় এল দুষ্ট মতলব। ইসারা করলেন ছেলেদের। সবাই মিলে রাজী করাল ঠাকুরকে তাদের চক্রে বসতে হবে।

গান থেমে গেল। মাঝখানে বসে আছেন ঠাকুর আর চারপাশে ছেলেরা চোখ বুজে সবাই মনে মনে আহ্বান জানাচ্ছে কোন এক প্রেতাত্মাকে।

অল্পক্ষণ পরে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন ঠাকুর। ওরা টের পাবার আগেই নিঃশব্দে উঠে এলেন ওই চক্র থেকে।

—শনি রবি দু'দিনই ঠাকুরের ঘরে ভক্তের মেলা বসত। কলকাতার বাবুরা প্রায়ই হাজির হতেন ছুটির পরে। কথায় গানে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যেত বোঝাই যেত না।

সন্ধ্যা হল। একে একে সবাই বিদায় নিল ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে। একজন কিন্তু গেলেন না। নিরঞ্জনদাদা কখন যে বাগান থেকে এসে ভিড়ে গিছলেন ভক্তদের মধ্যে, খেয়াল করে নি কেউ। আত্মসমাহিত যোগীর মতো নিরঞ্জনদাদা বসে থাকলেন ঠাকুরের দিকে মুখ করে।

নেমে এলেন ঠাকুর। বসলেন নিরঞ্জনদাদার পাশে। নাম-ধাম সব জেনে নিলেন এক একটি প্রশ্ন করে। তারপর রহস্যপ্রিয় ঠাকুর পরিহাসকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে আমার উপর আবার ভূত নামাবি না কি?'

ঠাকুরের সহজ সরল ব্যবহারে নিরঞ্জনদাদার মনে হল ঠাকুর যেন তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের আপনজন। ক্ষণিকের পরিচয় অথচ কি নিবিড় আত্মীয়তা!

ভূত নামানোর কথা শুনে লজ্জা পেলেন নিরঞ্জনদাদা। সান্ত্বনার সুরে ঠাকুর বললেন, 'দ্যাখ নিরঞ্জন, ভূত ভূত করলে তুই ভূত হয়ে যাবি, আর ভগবান ভগবান করলে ভগবানই হবি। তা কোনটা হওয়া ভাল?'

সাদা মনের মানুষ নিরঞ্জনদাদা। বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বললেন, 'তা হলে ভগবান হওয়াই ভাল।'

খুশী হলেন ঠাকুর। উপদেশের ছলে বললেন, 'ওদের সঙ্গ ত্যাগ কর্। ওরা হল হুজুগে লোক। তুই ভাবছিস লোকের উপকার করছিস। দ্যাখ নিরঞ্জন, তুই যদি সংসারীর নিরানব্বইটি উপকার করিস আর একটা অপকার করিস তবে লোকে আর তোকে দেখতে পারবে না, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তুই যদি নিরানব্বইটি অপরাধ করিস আর একটা তাঁর প্রীতির কাজ করিস, তাহলে তিনি তোর সব অপরাধ মার্জনা করবেন। মানুষের ভালবাসায় আর ভগবানের ভালবাসায় এত তফাত জানবি।'

আরও কত কথা হল। কত উপদেশ দিলেন ঠাকুর নিরঞ্জন-দাদাকে। যেন কতকাল পরে নিজের লোকের দেখা পেয়েছেন ঠাকুর। কথা শেষ আর হয় না।

হঠাৎ খেয়াল হল ঠাকুরের। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন,—নিরঞ্জন বাড়ি ফিরবে কি করে—অন্ধকারে! বললেন, 'নাইবা আজ বাড়ি গেলি? এখানেই আজ থাক না—'

মামার বাড়ি থাকতেন নিরঞ্জনদাদা। রাশভারী মানুষ মামা। রাত্রে বাড়ি না ফিরলে রাগ করবেন, এই ভয়ে নিরঞ্জনদাদা রাজী

হলেন না। ' ঠাকুর আবার বললেন, 'ওরে, এতটা যেতে কষ্ট হবে। যাস নি, থেকে যা।'

নিরঞ্জনদাদার অনড় জিদ। কিছুতেই রাজী হলেন না। হতাশ হয়ে ঠাকুর বললেন, 'একান্তই যাবি তো যা, কিন্তু আবার আসিস। কবে আসবি ?'

ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন নিরঞ্জনদাদা। হাতটা মাথায় ও বুকে ঠেকিয়ে বললেন, 'দেখুন না, দু'চারদিনের মধ্যেই আসছি।'

কথা রেখেছিলেন নিরঞ্জনদাদা। হাজির হয়েছিলেন ঠাকুরের কাছে আর এক সন্ধ্যায়। দূর থেকে ঠাকুর যেই দেখলেন নিরঞ্জনদাদা আসছে তাঁর ঘরের দিকে, তড়ি-ঘড়ি বেরিয়ে পড়লেন ঠাকুর। দু'হাত বাড়িয়ে বুকে টেনে নিলেন নিরঞ্জনদাদাকে। আকুলকণ্ঠে বলে উঠলেন ঠাকুর—'ওরে নিরঞ্জন, দিন যে যায়রে—তুই ভগবান লাভ করবি কবে ? দিন যে চলে যায়, ভগবানকে লাভ না করলে সবই যে বৃথা হবে। তুই কবে তাঁকে লাভ করবি বল, কবে তাঁর পাদপদ্মে মন দিবি বল ? আমি যে ভেবেই আকুল !'

কোন এক অজানা অপার্থিব দৈবী ভাবে ভরে উঠল নিরঞ্জনদাদার প্রস্তরকঠিন হৃদয়। কে যেন উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাল অন্তরের অন্তস্তল থেকে—ওরে নিরঞ্জন, গুরুই সব। পরম করুণাময় গুরু সর্বস্ব বিলিয়ে দেবার জন্য কল্পতরু হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর নয়, যায় যায় যায় যে সময়।

বাক্‌রোধ হয়ে গেছে নিরঞ্জনদাদার। মনে মনে ভাবতে লাগলেন, ইনি কে ? আমার ভগবানলাভ হচ্ছে না বলে, দিন চলে যাচ্ছে বলে, আমার জন্য এঁর এত আর্তি কেন ? পরের জন্য এ কি অহৈতুকী ভালবাসা !

মত্ত মাতঙ্গ বশ হল, স্বেচ্ছায় বাঁধা পড়ল স্নেহের শিকলে। প্রেম যমুনার মন্দাকিনী ধারায় স্নাত হয়ে নবজন্ম লাভ করলেন নিরঞ্জন-দাদা। নররূপী নারায়ণের লীলাসঙ্গী হবার জন্য ধরাধামে যাদের আগমন, সেই সব ঈশ্বরকোটি সন্তানেরা একে একে সবাই হাজির হয়েছেন।

বাকী ছিলেন একমাত্র নিরঞ্জনদাদা। অবশেষে তিনিও সমর্পণ করলেন নিজেকে সেই পরমপুরুষের পদপ্রান্তে—রানী রাসমণির জামাই, সেজবাবু, যাঁকে ডাকতেন বাবা বলে। কে তিনি? তিনিই কালীবাড়ির ছোট ভটচায—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। এই পরমহংসদেবই আশ্রয়দাতা ও প্রভু হয়ে বসেছিলেন একদল চিহ্নিত ভক্ত সাধকের, এবং ভক্ত সাধিকার। আমার বর আর আমি হয়তো পূর্বজন্মের কোন সুকৃতির বলে, কৃপাময় ঠাকুরের অহেতুকী কৃপার বলে, সেদিন স্থান পেয়েছিলাম ঐ সব চিহ্নিত ভক্ত, ঐ সব ঈশ্বরকোটি এবং জীব কোটি সাধক সাধিকাদের পাশে।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ